সুদ নিষিদ্ধ

পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুদ নিষিদ্ধ
পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের
ঐতিহাসিক রায়

বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুদ নিষিদ্ধ
পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী

তরজমা
অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

নতুন সফর প্রকাশনী

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪২৮
চৈত্র ১৪১৩
মার্চ ২০০৭

প্রকাশক
মুহাম্মদ আশরাফ হোসেইন
নতুন সফর প্রকাশনী
১৬৭/এ ওয়াপদা রোড
পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
ফোন : ০১৮১৭-৬২৩৩২৬

স্বত্ব
এ বইয়ের সর্বস্বত্ব অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

দাম
একশ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশকের কথা

সুদ মানবজাতির জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ। সুদ লুটেরা ও শোষকদের বড় হাতিয়ার এবং সুদ সাধারণ মানুষকে হতদরিদ্র ও নিঃস্ব করে দেয়- ঋণের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ করে ফেলে। সুদ অর্থনৈতিক জীবনকে করে তোলে অশান্ত এবং সামাজিক জীবনে সৃষ্টি করে অস্থিরতা। এ জন্যই আল্লাহপাক সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) লানত বর্ষণ করেছেন সুদের ওপর।

ইসলামী শাসনের অনুপস্থিতির কারণে মুসলিম দেশগুলোও সুদের অভিশাপ থেকে বাঁচতে পারেনি। সারা বিশ্বই বলতে গেলে সুদের অক্টোপাশে বন্দী। অথচ মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক মুক্তির পূর্ব শর্তই হচ্ছে সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থা। এলক্ষ্যে অবশ্য মুসলিম স্কলাররা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এর ফলে গত শতকের শেষ ভাগে কিছু কিছু দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন হয়। বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকের সফর শুরু হয়। সুদমুক্ত এ ব্যবস্থা শুধু মুসলিমদেরই নয়, অমুসলিমদের মধ্যেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পায়। এ সময়ে পাকিস্তান ফেডারেল শরীয়াহ কোর্ট সুদ নিষিদ্ধ করে যে ঐতিহাসিক রায় দেন তা সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ আপিলেট বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী প্রদত্ত রায়ের বাংলা তরজমাই হলো এ গ্রন্থ *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়।*

বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানীর প্রদত্ত রায় প্রথম ছাপা হয় লাহোর থেকে প্রকাশিত *শরিয়ত ল রিপোর্টস*-এর ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যায়। পরে অবশ্য এটি গ্রন্থাকারেও বেরোয়।

ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ডাইরেক্টর ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন এ রায় মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় তরজমা করেছেন। তিনি নিজেও

www.pathagar.com

অনেক বছর যাবত সুদ নিয়ে গবেষণা করছেন। সুদের ওপর তার একাধিক পুস্তক ও বহু নিবন্ধ রয়েছে। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তির হাতেই তরজমার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সাবলিল তরজমা, সন্দেহ নেই, একটি দুঃসাধ্য কাজ। আর সেটা করতে পেরেছেন বলেই অধ্যাপক শরীফ হুসাইন ইতিমধ্যেই সুধীজনের প্রশংসা পেয়েছেন।

বলা দরকার, *সুদ হারাম কেন* শিরোনামে এ লেখাটি *মাসিক নতুন সফর*-এ বেশ কিছু কাল প্রকাশিত হয়। দু'হাজার চার সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশের পরই সুধী-বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি কাড়ে। তাদের তাগিদেই পুরো অনুবাদ কাজটি সম্পন্ন হয় এবং এর শেষ কিস্তি ছাপা হয় দু'হাজার পাঁচ সালের অক্টোবর সংখ্যা *নতুন সফরে*। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এটি পুস্তক আকারে বের হতে যথেষ্ট সময় লেগে গেলো। এ জন্য আমরা দুঃখিত।

এ বই প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা অনেকের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি। তরুণ কবি ওমর বিশ্বাস নানাভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। আমরা এদের সবার কাছেই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি। আর যারা ভরসা করে তাদের একমাত্র তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।

১. ১৪.১১.৯১ তারিখে বিজ্ঞ ফেডারেল শরীয়া কোর্ট দেশে প্রচলিত বেশ কয়েকটি আইনকে ইসলামের বিধিবিধান ও নীতিমালার পরিপন্থী ঘোষণা করে এক রায় প্রদান করেন। কারণ সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে সুদ লেনদেনের ব্যবস্থা সংযোজিত আছে। বিজ্ঞ ফেডারেল শরীয়াহ কোর্টের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এসব আইনে বর্ণিত সুদ 'রিবা'র সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত আর আল-কুরআন 'রিবা'কে নিষিদ্ধ (হারাম) করেছে। ফেডারেল শরীয়াহ কোর্টের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে এসব আপীল দায়ের করা হয়।

২. আপীলগুলোর মৌলিক বিষয় একই ধরনের হওয়ায় সবক'টি আপীলের শুনানী এক সাথে করা হয়েছে এবং একটি মাত্র রায়ের মাধ্যমে সবগুলো আপীলের নিষ্পত্তি করা হলো।

৩. অধিকাংশ আপীলকারী ও জুরিস-কনসাল্ট এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সুদ ভিত্তিক বাণিজ্যিক লেনদেন আধুনিক কারবারের উদ্ভাবন। এ সব লেনদেনের ইতিহাস ৪০০ শত বছরের বেশী নয়। সুতরাং এসব লেনদেন আল-কুরআনে বর্ণিত 'রিবা'র আওতায় পড়ে না। তার ওপর আল-কুরআনে আরোপিত 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞা আধুনিক কালের 'ইন্টারেস্ট' ভিত্তিক লেনদেনের ওপর প্রযোজ্য নয়।

৪. এই মতের সমর্থনে ইন্টারেস্ট নিষিদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে আমাদের সামনে বিভিন্নমুখী পাঁচ ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

৫. প্রথম যুক্তি হচ্ছে 'রিবা' শব্দের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত। কয়েকজন আপীল দায়েরকারী বলেন, আল-কুরআনের রিবা নিষিদ্ধকারী আয়াতসমূহ রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এসব আয়াতের পরিপূর্ণ ও

www.pathagar.com

যথার্থ ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাননি। সুতরাং আল-কুরআন অথবা রাসূলের (সা.) সুন্নায় 'রিবা'র সুনির্দিষ্ট ও ধরা-বাঁধা কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। যেহেতু 'রিবা' শব্দের অর্থ অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থবোধক রয়ে গেছে সেহেতু এটা 'মুতাশাবিহাতে'র আওতায় পড়ে এবং এর সঠিক অর্থ কারো জানা নেই। এই যুক্তি অনুসারে 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত লেনদেন পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত। আধুনিক কালের ব্যাংক ব্যবস্থায় যে ধরনের লেনদেন হয়, কুরআন নাযিলকালে এরূপ লেনদেনের কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞাকে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যায় না।

৬. দ্বিতীয় ধারার যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে 'রিবা'র হারকে ভিত্তি করে। বলা হয়েছে, 'রিবা' বলতে কেবল উচ্চ সুদের হারের ঋণকে (usurious loan) বুঝায়, যাতে ঋণদাতা মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদ ধার্য করত, যার অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে শোষণ। কিন্তু আধুনিক ব্যাংকের সুদকে 'রিবা' বলা যায় না, যদি এই সুদের হার উচ্চ বা শোষণমূলক না হয়।

৭. তৃতীয় ধারার যুক্তিতে ভোগ্য ঋণ ও বাণিজ্যিক ঋণের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে বলা হয়। এ যুক্তিতে বলা হয় যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'আল-রিবা' শব্দ দ্বারা কেবল দরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্তৃক তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে গৃহীত ভোগ্য ঋণের ওপর আরোপিত সুদকে বুঝানো হয়েছে। এসব ভোগ্য ঋণগ্রহীতারা ছিল অত্যন্ত গরীব; মানবিক কারণেই তারা ছিল সহানুভূতি ও সহমর্মিতা পাবার অধিকারী। কিন্তু বিত্তবান লোকেরা তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করত এবং তাদের ঋণের ওপর অতি উচ্চ হারে সুদ ধার্য করত। কুরআন মজীদ এই প্রথাকে মানবতার বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে এবং এ জঘন্য লেনদেন কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু আধুনিক কালের বাণিজ্যিক ঋণ ব্যবস্থা একান্তই এ কালের। নবীর (সা.) যুগে আধুনিক বাণিজ্যিক ঋণ ব্যবস্থার অস্তিত্বই ছিল না। আর আল-কুরআন যে 'রিবা' নিষিদ্ধ করেছে, আধুনিক বাণিজ্যিক ঋণের সুদ তার আওতায় পড়ে না। তাছাড়া সুদ নিষিদ্ধ করার পেছনে মৌলিক যে দর্শন রয়েছে, আধুনিক কালের বাণিজ্যিক ও উৎপাদনশীল ঋণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, এ কালের ঋণগ্রহীতাগণ দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা হচ্ছে সম্পদশালী ধনীক শ্রেণীর লোক অথবা কমপক্ষে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল। আর তাদের গৃহীত ঋণ মুনাফা অর্জনে খাটানো হয় বা

www.pathagar.com

বিনিয়োগ করা হয়। সুতরাং তাদের গৃহীত ঋণের ওপর ঋণদাতা কর্তৃক ধার্যকৃত কোন অতিরিক্তকে 'জুলুম' (injustice) বলা যায় না, যা 'রিবা' হারাম করার মূল কারণ।

৮. সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন কালে চতুর্থ ধারার যুক্তিতে বলা হয় যে, আল-কুরআন কেবল 'রিবা আল-জাহেলিয়াত'কে নিষিদ্ধ করেছে। আর রাসূলের (সা.) বেশ কটি হাদীসে দেখা যায়, জাহেলিয়াতের যুগে এক বিশেষ ধরনের ঋণ লেনদেন হতো, যাতে ঋণ প্রদান কালে কৃত চুক্তিতে ঋণের আসলের ওপর কোন অতিরিক্ত ধার্য করা হতো না। অতঃপর ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণদাতা তার আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করে পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত। এই তত্ত্ব অনুসারে ঋণের প্রাথমিক (initial) চুক্তিতে ঋণের আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করার শর্ত করা না হলে এবং পরবর্তীতে ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে সময় বাড়িয়ে দিলে, সে বৃদ্ধি 'রিবা আল-কুরআন' হয় না; বরং তা 'রিবা আল-ফদলের' সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। আর 'রিবা আল ফদল' নিষিদ্ধ করা হয়েছে রাসূলের (সা.) সুন্নাহ দ্বারা। তুলনামূলকভাবে এ নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব কম, একে বড় জোড় 'মকরুহ' বলা যায়, 'হারাম' নয়। সুতরাং বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল যোগ্য এবং অমুসলিমদের বেলায় তা আদৌ প্রযোজ্য নয়। কেবল মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ আইন হওয়ার কারণে তা 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন'-এর (Muslim Personal Law) পর্যায়ভুক্ত। এসব কারণে পাকিস্তানের সংবিধানের ২০৩ (বি) ধারা মোতাবেক ফেডারেল শরীয়াহ কোর্টকে যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, 'সুদের নিষেধাজ্ঞা' সে এখতিয়ার বহির্ভূত।

৯. সুদ হারাম হওয়ার বিরুদ্ধে পঞ্চম ধারার যুক্তিতে বলা হয় যে, যদিও 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞা আধুনিক কালের সুদী লেন-দেনের ওপরও প্রযোজ্য তবু একথা সত্য যে, বিশ্বব্যাপী আধুনিক অর্থনৈতিক কায়কারবারের মেরুদণ্ড হচ্ছে বাণিজ্যিক সুদ। সুদী লেন-দেন ছাড়া কোন দেশের পক্ষেই চলা (live) সম্ভব নয়। দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বের লেনদেন থেকে সুদ তুলে দিলে তা হবে আত্মহত্যার শামিল। বাস্তববাদী আদর্শ হিসেবে ইসলাম প্রয়োজনের নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছে। এজন্য ইসলাম প্রয়োজনে শূকর খাওয়ারও অনুমতি দিয়েছে, যদি দেখা যায় যে, তা না খেয়ে বাঁচার আর কোন উপায় নেই। প্রয়োজনের এই নীতিকে সুদী

www.pathagar.com

লেনদেনের ক্ষেত্রেও মেনে নেয়া উচিত এবং এই প্রয়োজনের তাকিদেই সুদী লেনদেন অনুমোদন প্রদানকারী প্রচলিত আইনগুলোকে ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থী ঘোষণা করা উচিত নয়।

১০. উল্লিখিত বিভিন্নমুখী যুক্তির প্রেক্ষিতে আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয় হচ্ছে : আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থায় প্রচলিত বাণিজ্যিক সুদ আল-কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা'র সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে কি না। যদি তা পড়ে তাহলে প্রয়োজনের তাকিদে সে সুদের অনুমোদন দেয়া যায় কি না। এ প্রেক্ষিতে আমাদেরকে এটাও দেখতে হবে যে, আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে সুদ উচ্ছেদ করে একে সুদ মুক্ত করে গড়ে তোলা (design) সম্ভব কি না এবং আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক কাঠামোর মধ্যে সুদমুক্ত বিকল্প পদ্ধতিসমূহের সংযোজন ও বাস্তবায়ন (feasible) সম্ভব কি না। এসব বিষয় সমাধান করার লক্ষ্যে আমরা বেশ কয়েকজন শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রখ্যাত ব্যাংকার, হিসাব বিজ্ঞান বিশারদ এবং আধুনিক কারবার প্রতিনিধিকে জুরিস-কনসাল্ট হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাঁরা নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আদালতকে সহযাগিতা করেছেন।

www.pathagar.com

আল-কুরআনের সুদ সংক্রান্ত আয়াত সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা

১১. উল্লিখিত সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করার পূর্বে আল-কুরআনের সুদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা দরকার। আল-কুরআনে 'রিবা' সম্পর্কে চার ধরনের আয়াত রয়েছে যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নাযিল করা হয়।

১২. 'রিবা' সম্পর্কে আল-কুরআনে প্রথম নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সূরা আর-রূমের ৩৯ নম্বর-আয়াত। এ সূরাটি রাসূলের (সা.) মক্কী জিন্দেগীতে নাযিল হয়েছে। এ সূরায় 'রিবা' সম্পর্কে বলা হয়েছে:

এবং লোকদের সম্পদের সাথে শামিল হয়ে বৃদ্ধি পাবে এইজন্যে তোমরা যে সুদ (রিবা) দাও, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না।

১৩. 'রিবা' সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে সূরা আন-নিসার ১৬১ নম্বর আয়াত। এখানে ইহুদীদের নানা অপরাধ, অন্যায় ও অপকর্মের বিবরণ দিতে গিয়ে তাদের সুদ খাওয়ার কথাও বলা হয়েছে:

এবং তাদের সুদ (রিবা) খাওয়ার দরুণ, যদিও তাদের তা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল।

১৪. সুদ সম্পর্কিত তৃতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াত। এ আয়াত দ্বারা সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা সুদ (রিবা) খেয়ো না যা দ্বিগুণে-বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

১৫. 'রিবা' সংক্রান্ত চতুর্থ পর্যায়ে নাযিলকৃত আয়াতসমূহ রয়েছে সূরা আল-বাকারায়। এ সূরার ২৭৫ থেকে ২৮১ নম্বর আয়াতগুলোর অর্থ হচ্ছে :

যারা সুদ (ইউসারী বা ইন্টারেস্ট) খায় তারা সেই ব্যক্তির মত উত্থিত হবে, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা সুস্থ-জ্ঞানশূন্য-পাগল করে দিয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা বলে 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই'। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে 'হালাল' করেছেন এবং সুদকে করেছেন 'হারাম'। কাজেই যার কাছে তার প্রভুর নিকট থেকে উপদেশ পৌঁছবে এবং সুদখোরী থেকে বিরত থাকবে, সে পূর্বে যা খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, তার ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত থাকবে। আর যারা পুনরাবৃত্তি করবে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে (২৭৫)।

www.pathagar.com

আল্লাহ সুদকে ধংস করেন, আর সাদাকাকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে ভালবাসেন না (২৭৬)।

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় নিশ্চয়ই তারা তাদের আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিফল লাভ করবে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তাদের কোন চিন্তাও নেই (২৭৭)।

ওহে যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদ বাবদ যা পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক (২৭৮)। যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমরা মেনে নাও (তওবা কর) তবে তোমাদের আসল তোমাদেরই। তোমরা যুলুম করবে না, তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না (২৭৯)। ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত সময় দাও। আর যদি সাদকা করে দাও তা তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর, যদি তোমরা সত্যিই জান (২৮০)। আর সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবে। অতঃপর প্রত্যেকে যা কিছু অর্জন করেছে তার প্রতিফল তাকে পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং কারো ওপর অবিচার (জুলুম) করা হবে না (২৮১)।

www.pathagar.com

রিবা সংক্রান্ত আয়াতের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ

১৬. সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এখানে 'রিবা' সম্পর্কিত আয়াতগুলো নাযিলের পর্যায়ক্রমিক ধারা আলোচনা করা দরকার। এ ধারাক্রম জানা থাকলে পরবর্তী আলোচনা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

সূরা আল-রূম

১৭. প্রথম নাযিলকৃত 'রিবা'র এ আয়াতটি সূরাতুর রূমের অন্তর্ভুক্ত। এ সূরাটি যে মক্কায় নাযিল হয়েছে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়নি। এখানে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, 'রিবা' আল্লাহর কাছে বাড়ে না অর্থাৎ পরকালের জীবনের জন্য 'রিবা' কোন সুফল বয়ে আনবে না। আল-কুরআনের তফসীরকারদের অনেকেরই অভিমত হচ্ছে, আয়াতে 'রিবা' শব্দ দ্বারা 'ইউসারী' (usury) বা 'ইন্টারেস্ট' (interest) বুঝানো হয়নি। ইবনে জরির আততাবারি (মৃঃ ৩১০ হিঃ) আল-কুরআনের প্রখ্যাত মুফাসসীর ছিলেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) সহ সাঈদ ইবনে যুবায়ের, মুজাহিদ, তাউস, কাতাদাহ, যাহ্হাক এবং ইব্রাহীম আল নখয়ী প্রমুখ তাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতে 'রিবা' শব্দ দ্বারা এমন উপহার, উপঢৌকন বা দানকে (gift) বুঝানো হয়েছে, যা কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে এই আশায় দান করে যে, গ্রহীতা প্রতিদানে তাকে আরও বড় কিছু দান করবে।[১] তবে অপর কতিপয় মুফাস্‌সেরীনে কেরাম এ আয়াতে ব্যবহৃত 'রিবা' শব্দকে সুদ (usury) অর্থে গ্রহণ করেছেন। ইবনে আল-জাওযি এই মতের প্রবক্তা হিসেবে হাসান আলবসরীর নাম উল্লেখ করেছেন।[২] এই মতটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কারণ আল-কুরআনের অন্যান্য স্থানে 'রিবা' শব্দটি সুদ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত 'রিবা' শব্দের অর্থ যদি সুদ (usury) হয়, তাহলে এ আয়াতে সুদের ওপর স্পষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং এখানে যে কথার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে, 'রিবা'র জন্য পরকালীন জীবনে আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে এখানে এ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সুদী কারবার আল্লাহর আনুকূল্য ও অনুগ্রহ (favour) থেকে বঞ্চিত হয়।

www.pathagar.com

১৮. 'রিবা' সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বিতীয় আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে 'সূরাতুন্নিসা'তে। ইহুদীদের কৃত পাপ ও অপকর্মসমূহের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদীরা 'রিবা' খেতো, যদিও তাদেরকে তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ আয়াত নাযিলের সঠিক সময় নির্ণয় করা কঠিন। আল-কুরআনের অধিকাংশ তফসীরকারই এ বিষয়ে নীরব। তবে যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত চতুর্থ হিজরীর পূর্বেই এ আয়াত নাযিল হয়ে থাকবে। সূরাতুন্নিসার ১৫৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

আহলি কিতাবগণ তোমার কাছে দাবী করে যে, তুমি আকাশ থেকে তাদের জন্য কিতাব নাযিল করাবে।

১৯. এই আয়াত ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সূরাতুন্নিসার এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতসমূহ ইহুদীদের উক্ত দাবীর প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছে। ইহুদীরা নবীর (সা.) দরবারে এসে তাঁকে নানা ধরনের প্রশ্ন করে বিব্রত করার অপচেষ্টা করত। এই ইহুদীরাই নবীর (সা.) কাছে দাবী করেছিল, মুসা (আ.)-কে যেমন একটি কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের জন্য তেমনি একটি কিতাব আসমান থেকে নাযিল করানোর জন্য। তার উত্তরে আল্লাহতায়ালা পরবর্তী আয়াতসমূহ নাযিল করেন। এর অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, ইহুদীরা যখন অধিক সংখ্যায় মদীনায় ছিল এবং নবীর (সা.) সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়ার অবস্থা যখন তাদের ছিল সেই সময়ে এ আয়াতে করীমা নাযিল হয়েছে। আর যেহেতু চতুর্থ হিজরীর পরে অধিকাংশ ইহুদীই মদীনা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেহেতু মনে হয়, চতুর্থ হিজরীর পূর্বে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াতে ব্যবহৃত 'রিবা' শব্দের অর্থ যে সুদ (usury) তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, ইহুদীদের জন্য প্রকৃতপক্ষে সুদই নিষিদ্ধ ছিল। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট আজও এ নিষেধাজ্ঞাসূচক বাণী বহন করে চলছে। কিন্তু এ থেকে একথা বলা যাবে না যে, এ আয়াত দ্বারা তৎকালীন মুসলমানদের জন্য সরাসরি ও স্পষ্টভাবে 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বরং এখানে কেবল একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদীদের জন্য 'রিবা' নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবে তারা এ নিষেধাজ্ঞা মেনে চলেনি। তবে এ থেকে এটা অনুমান (inference) করা যেতে পারে যে, সুদ খাওয়া মুসলমানদের জন্যও পাপজনক কাজ ছিল; অন্যথায় এ কাজের জন্য তাদের দোষারোপ বা দায়ী করার কোন অবকাশ তখনও তাদের ছিল না।

www.pathagar.com

সূরা-আলে ইমরান

২০. 'রিবা' সংক্রান্ত তৃতীয় পর্যায়ে নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াত। ধারণা করা হয় যে, এ আয়াত তৃতীয় হিজরীর পরে কোন এক সময়ে নাযিল হয়েছে। এ আয়াতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে ওহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে; আর ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরী তৃতীয় সালের শেষদিকে। এ আয়াতে মুসলিমদেরকে 'রিবা' খেতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কুরআন মজীদের এই আয়াতই হচ্ছে প্রথম আয়াত যার দ্বারা মুসলিমদের জন্য পরিষ্কার ভাষায় রিবা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, এ জন্যই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কালেই 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩] কোন কোন মুফাসসীরে কুরআন ওহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'রিবা'র এ নিষেধাজ্ঞা নাযিল করার কারণও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মক্কার হানাদাররা সুদী ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সৈন্য বাহিনীর জন্য অর্থ যোগানোর ব্যবস্থা করেছিল এবং এভাবে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিপুল অস্ত্রসম্ভার গড়ে তুলেছিল। আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে, কাফেরদের গৃহীত পন্থা মুসলমানদেরকেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রলুব্ধ করতে পারে এবং তারা লোকদের কাছ থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারে। এ ধরনের কাজ থেকে মুসলমানদের ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই তাদের জন্য পরিষ্কার ভাষায় সুদ নিষিদ্ধ করে সূরা আলে-ইমরানের 'রিবা' সংক্রান্ত এ আয়াত নাযিল হয়।[৪]

২১. ওহুদ যুদ্ধের আগে পরের কাছাকাছি কোন এক সময়ে 'রিবা'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সুনানে আবু দাউদে উল্লেখিত একটি হাদীস থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, আমর ইবনে আকিয়াশ এমন এক লোক ছিলেন যিনি সুদের ভিত্তিতে কিছু অর্থ ঋণ দিয়েছিলেন। পরে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন; কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণে এজন্য গড়িমসি করছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি প্রদত্ত ঋণের সুদ থেকে বঞ্চিত হবেন। ইতিমধ্যে ওহুদ যুদ্ধ শুরু হয়। ফলে আর কালক্ষেপণ না করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, মুসলিম বাহিনীর পক্ষে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৫]

২২. এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, ওহুদ যুদ্ধের পূর্বেই 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, আর আমর ইবনে আকিয়াশ এ কারণেই ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করছিলেন।

www.pathagar.com

২৩. সূরা আল-বাকারায় সন্নিবেশিত 'রিবা'র আয়াত সমষ্টি নাযিল হয়েছে চতুর্থ পর্যায়ে। এখানে 'রিবা'র ওপর নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এ আয়াতসমষ্টি নাযিলের পটভূমি হচ্ছে যে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) যাবতীয় 'রিবা'কে বাতিল ঘোষণা করলেন। ঘোষণায় বলা হলো যে, অতঃপর কেউ প্রদত্ত ঋণের ওপর কোন 'রিবা' দাবী করতে পারবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফের দিকে অগ্রসর হলেন; কিন্তু তায়েফ বিজয় করা সম্ভব হলো না। তায়েফের অধিবাসীদের বেশীর ভাগই ছিল সাকিফ গোত্রীয়। পরবর্তীতে সাকিফ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। প্রস্তাবিত উক্ত সন্ধি চুক্তির একটি শর্তে উল্লেখ ছিল যে, বনি সাকিফ গোত্রের লোকেরা তাদের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের পাওনা সুদ তারা ছেড়ে দেবে না; কিন্তু অন্যান্য ঋণদাতাদের কাছ থেকে তারা যে ঋণ গ্রহণ করেছে সে ঋণের সুদ ছেড়ে দিতে হবে। নবী (সা.) উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর না করে প্রস্তাবিত খসড়া সন্ধি চুক্তিপত্রের ওপর লিখে দেন যে, *বনি সাকিফদের সেই একই অধিকার থাকবে যা মুসলমানদের আছে।*[৮] প্রস্তাবিত চুক্তিটি রাসূল (সা.) গ্রহণ করেছেন মনে করে বনি সাকিফের লোকেরা বনি আমর ইবনে আল-মুগীরা গোত্রের কাছে তাদের প্রাপ্য সুদ দাবী করে। কিন্তু বনি মুগীরা, ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই কারণে সুদ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। বিষয়টি মক্কার গভর্নর আত্তাব ইবনে আসীদের (রা.) কাছে পেশ করা হলো। বনি সাকিফের যুক্তি হলো, সন্ধি চুক্তি অনুসারে তারা তাদের প্রাপ্য সুদ ছেড়ে দিতে বাধ্য নয়। আত্তাব ইবনে আসীদ (রা.) বিষয়টি নবী করীম (সা.) এর নিকট পেশ করলেন। এ ঘটনা উপলক্ষেই সূরাতুল বাকারার ২৭৮ ও ২৭৯ নং আয়াত নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে:

ওহে যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদ বাবদ যা পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক (২৭৮)। যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমরা মেনে নাও (তওবা কর) তবে তোমাদের আসল তোমাদেরই। তোমরা যুলুম করবে না, তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না (২৭৯)।

২৪. বনু সাকিফ এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে এই বলে আত্মমর্পণ করে যে, *আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।*[৯]

সুদ কখন হারাম হলো

২৫. উপরে 'রিবা' সংক্রান্ত আল-কুরআনের আয়াত এবং সে আয়াতগুলো নাযিলের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিজরী তৃতীয় সালেই সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও এর পূর্বে সুদ নিষিদ্ধ করা

www.pathagar.com

হয়েছিল কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। আল-কুরআনের কতিপয় প্রখ্যাত মুফাসসীর সূরাতুর রূমে ব্যবহৃত 'রিবা' শব্দের অর্থ করেছেন সুদ। তাঁদের এ অর্থকে সঠিক ধরে নিলে দেখা যায় যে, রাসূলের (সা.) মক্কী জিন্দেগীতেই সুদকে প্রত্যাখ্যান (discard) করা হয়েছে। আর এ কারণেই কতিপয় বিশেষজ্ঞের অভিমত হচ্ছে যে, ইসলামে সুদের অনুমোদন কখনও ছিল না। ইসলাম শুরু থেকেই সুদ নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রথম দিকে এ নিষেধাজ্ঞার গুরুত্বকে জোড়ালোভাবে তুলে ধরা হয়নি। কারণ এ সময়ে মক্কার কাফেররা মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছিল। এর মোকাবিলায় নিজেদের ঈমান রক্ষা করে চলাই ছিল মুসলমানদের মূল লক্ষ্য। সুদী কারবারে লিপ্ত হওয়ার মত অবকাশ এ সময়ে তাদের আদৌ ছিল না। স্কলারদের এ অভিমত সম্পর্কে বিতর্কে যাওয়ার দরকার নেই; তবে এ সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, তৃতীয় হিজরীতে সুদের উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

২৬. কতিপয় আপীলকারী এবং জুরিসকনসাল্ট এই উক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং জোড়ালোভাবে বলেছেন যে, নবীর (সা.) জীবনের শেষ বছর সুদের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এ মতের সমর্থনে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন তিন ধরনের হাদীস তুলে ধরেছেন।

২৭. প্রথমত, বেশ কিছু এমন হাদীস পেশ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। রাসূল (সা.) এ সময়েই সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, শুধু তাই নয়, বরং এসময়েই সর্বপ্রথম তিনি তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের (রা.) পাওনা সাকুল্য সুদ মওকুফ বা বাতিল ঘোষণা করেন। এ ঘোষণা প্রমাণ করে যে, সর্বপ্রথম যে সুদকে বাতিল করা হয় তা হচ্ছে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের (রা.) সুদ। এর অর্থ হচ্ছে যে, রাসূলের (সা.) বিদায় হজ্জ, অর্থাৎ ১০ম হিজরীর আগে সুদের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ছিল না বা তা বাস্তবায়িত হয়নি।

২৮. কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে, এ যুক্তি ভ্রান্ত ধারণার ওপর ভিত্তিশীল। বস্তুত সুদের নিষেধাজ্ঞা হিজরী তৃতীয় সাল থেকেই কার্যকর হয়েছে। রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জে মুসলমানদের বিশাল সমাবেশে ইসলামের মৌলিক বিধি বিধান সমূহ পুনরায় ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বিদায় হজ্জের সমাবেশ ছিল তৎকালীন মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ। উপস্থিত বিপুল সংখ্যক মুসলমানের কাছে ইসলামের বিধি-নিষেধ সমূহ পৌঁছানোর এ সুযোগে তিনি জাহেলিয়াতের যুগে নিষিদ্ধ ছিল, পরে ইসলামও নিষিদ্ধ করেছে, এরকম বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এর পূর্বে সেসব নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সা.) মানুষের জীবন ও সম্ভ্রমের পবিত্রতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন; তিনি মদকে হারাম ঘোষণা করেন

www.pathagar.com

এবং নারীদের প্রতি অসদাচরণ, পরনিন্দা ও পারস্পরিক ঝগড়া-কলহ থেকে মুসলমানদের সতর্ক করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব বিধি-নিষেধ বহু পূর্ব থেকেই কার্যকরভাবে চালু ছিল। কিন্তু নবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে এগুলো পুনরাবৃত্তি করেন যাতে বিপুল সংখ্যক শ্রোতার সকলেই পরিপূর্ণভাবে তা জানতে পারে এবং কেউ যেন এ ব্যাপারে অজ্ঞতার দোহাই দিতে না পারে। একই কথা সুদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। অনেক পূর্বেই সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিদায় হজ্জের ভাষণে তা অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে মাত্র। সেই সাথে নবী করীম (সা.) একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতঃপর সুদের আর কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না, সকল দাবীই বাতিল গণ্য হবে। এটা এমন এক সময় ছিল যখন সারা আরব উপদ্বীপের গোত্রসমূহ ব্যাপকভাবে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছিল। তাদের মধ্যে সুদের প্রচলন ছিল ব্যাপক। আশংকা ছিল যে, এসব গোত্রের লোকেরা একে অন্যের কাছ থেকে সুদ আদায় অব্যাহত রাখতে পারে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদের নিষেধাজ্ঞা পুনরায় ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হলেন না; তিনি পূর্ববর্তী যাবতীয় পাওনা সুদও বাতিল ঘোষণা করলেন। এই প্রেক্ষাপটেই তিনি তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের (রা.) পাওনা সুদও ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলের (সা.) চাচা আব্বাস (রা.) ৮ম হিজরীতে, মক্কা বিজয়ের মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮] ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতেন এবং ঋণগ্রহীতাদের কাছে তাঁর পাওনার পরিমাণ ছিল বিরাট।[৯] মক্কা বিজয়ের পরই আব্বাস (রা.) হিজরত করে মদীনায় চলে যান; তিনি ঋণগ্রহীতাদের সাথে দেনা-পাওনা মিটিয়ে যেতে পারেননি। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় তিনি রাসূলের (সা.) সাথে হজ্জ করতে এলে উক্ত দেনা-পাওনা মেটানোর প্রথম সুযোগ লাভ করেন। তাই রাসূল (সা.) তাঁর চাচা আব্বাসের (রা.) পাওনা যাবতীয় সুদ বাতিল ঘোষণা করেন এবং ঋণগ্রহীতাদের সুদের দেনা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রদানের কথা জানিয়ে দেন। এ ঘোষণায় সুদকে 'প্রথম রিবা' বলা হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, ইতিপূর্বে আর কোন 'রিবা' বাতিল করা হয়নি। বরং এর অর্থ হচ্ছে বিদায় হজ্জের সময়ে বাতিলকৃত এটাই হচ্ছে প্রথম সুদ। এর আগে আমরা বনু সাকিফ গোত্রের কথা উল্লেখ করেছি। মক্কা বিজয়ের পর অর্থাৎ বিদায় হজ্জের দুই বছর পূর্বে তারা তাদের কাছ থেকে ঋণগ্রহীতাদের নিকট সুদ দাবী করে; কিন্তু তাদের সে দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। সুতরাং এ কথা বলা যেমন ঠিক নয় যে, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের (রা.) পাওনা সুদ হচ্ছে সেই সুদ যা সর্বপ্রথম বাতিল করা হয়েছিল; তেমনি একথাও ঠিক নয় যে, বিদায় হজ্জের সময়েই সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রথমবারের মত কার্যকর করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সুদের আয়াত সর্বশেষে নাযিলের যুক্তি

২৯. দ্বিতীয়ত, রাসূলের (সা.) জীবনের শেষ অধ্যায়ে সুদের আয়াত নাযিল হয়েছে, এই মতের পক্ষে ইমাম বুখারী (রা.) বর্ণিত আর একটি হাদীস পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা.) সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, *রাসূলুল্লাহর (সা.) ওপর আল-কুরআনের সর্বশেষে নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সুদের আয়াত।*[১০]

৩০. কিন্তু এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এ কথা বলেননি যে, শরীয়তের সর্বশেষ বিধান হচ্ছে সুদ হারাম করার বিধান। বরং তিনি কেবল একথা বলেছেন যে, রাসূলের (সা.) ওপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে 'রিবা'র আয়াত। আর এর দ্বারা নিঃসন্দেহে উপরে উল্লিখিত সূরা আল-বাকারার আয়াতকে বুঝানো হয়েছে। আসলে এই আয়াতগুলোর শিরোনাম হিসাবেই 'রিবার আয়াত' কথাটি বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বক্তব্যকে যদি এর বাহ্যিক অর্থেই মেনে নেয়া হয়, তাহলে তাঁর এ বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, সূরা আলে ইমরান, সূরা আন-নিসা এবং সূরা আর রূম-এ উল্লেখিত 'রিবা' সংক্রান্ত আয়াতগুলো, সূরা আল-বাকারার 'রিবা'র আয়াতগুলোর পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ থেকে এ কথাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সূরা আল-বাকারায় উল্লেখিত সুদের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণিত উক্ত হাদীস থেকে এ অর্থ গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই যে, রাসূলের (সা.) জীবনের শেষ দিনগুলোতে সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

৩১. তাছাড়া ইবনে জরির আত-তাবারি সহ বেশ কয়েকজন স্কলার আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বক্তব্য কেবল সূরা আল-বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত। এ আয়াতে বলা হয়েছে:

এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন তোমাদের সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে, সে যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং কারো প্রতি যুলুম করা হবে না (২:২৮১)।

৩২. যেহেতু এই আয়াতকে সূরা আল-বাকারার সুদ সংক্রান্ত আয়াত অর্থাৎ ২৭৫-২৮০ নম্বর আয়াতের পরেই সংযোজন করা হয়েছে, সেহেতু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এ আয়াতকে 'রিবা'র আয়াত বলে অভিহিত করেছেন। একই কারণে ইমাম বুখারী (র.) তার কিতাবুত তফসীরে সূরাতুল বাকারার সুদের আয়াত (অর্থাৎ ২৭৫-২৮০) এবং ২৮১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা পৃথক পৃথক ভাবে করেছেন। উক্ত কিতাবের ৪৯ থেকে ৫২ অধ্যায়ে তিনি ২৭৫-২৮০ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।[১১] এখানে তিনি

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্ত হাদীস আনেননি। কিন্তু ২৮১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা যে অধ্যায়ে করেছেন সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্ত বক্তব্যের অর্থ এই হতে পারে যে, সূরা আল বাকারার ২৭৫-২৮০ নম্বর আয়াতগুলো, যেখানে সুদের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা পূর্বেই নাযিল হয়েছিল; কেবল ২৮১ নম্বর আয়াতটি রাসূলের (সা.) জীবনের শেষ সময়ের দিকে নাযিল হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত বনু সাকিফ এবং বনু মুগীরার মধ্যে সুদ দাবী ও তা নাকচ হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে এ মতের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। সেই ঘটনা প্রমাণ করে যে, সূরা আল-বাকারার ২৭৮ নম্বর আয়াত অবশ্যই মক্কা বিজয়ের পর পরই নাযিল হয়েছে। মক্কা বিজয় হয়েছিল ৮ম হিজরীতে; আর রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নেন ১১ হিজরীতে। মাঝখানে সময়ের ব্যবধান হচ্ছে দীর্ঘ তিন বছর। এ কথা কি করে ভাবা যায় যে, এ দীর্ঘ সময়ে আল-কুরআনের আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি! এটি একটি অলিক ধারণা এবং অসম্ভব ব্যাপার। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মত ব্যক্তিত্বের ওপর এর দায়-দায়িত্ব চাপানোর কথা চিন্তা করাও কঠিন। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, 'রিবা'র আয়াত বলতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সূরা আল বাকারার কেবল ২৮১ নম্বর আয়াতকেই বুঝিয়েছেন, অন্য কোন আয়াতকে নয়। আর তাঁর মতে ২৮১ নম্বর আয়াতটিই পৃথকভাবে রাসূলের (সা.) জীবনের শেষ দিনগুলোতে নাযিল হয়েছে। অবশ্য এটা হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ব্যক্তিগত মত। অন্যথায় কোন কোন সাহাবা আল-কুরআনের অন্য আয়াতকে শেষ নাযিলকৃত আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আল-সুয়ূতি তাঁর রচিত আল-ইতকান গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তফসীর ও হাদীসের অন্যান্য বহু গ্রন্থেও এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

৩৩. রাসূল (সা.)-এর জীবনের শেষ অধ্যায়ে নয়, বরং তার অনেক পূর্বেই সুদের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, ওপরের আলোচনা এসত্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

৩৪. উপসংহারে একথা বলা যায় যে, রাসূলের (সা.) মক্কী অধ্যায়েও সুদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে আয়াত নাযিল হয়েছে; কিন্তু পরিষ্কার ভাবে সুদ হারাম করে আল-কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে তৃতীয় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কোন এক সময়ে।

৩৫. রাসূলের (সা.) জীবনের শেষের দিনগুলোতে সুদের নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয়েছে- এ যুক্তির পক্ষে আপীলকারীগণ তৃতীয় যে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে হযরত ওমরের (রা.) একটি উক্তি। পরবর্তী ৫৬ প্যারায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

রিবা কাকে বলে

৩৬. এ পর্যায়ে আমরা সুদ কাকে বলে সে বিষয়ে আলোচনা করব। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 'রিবা'র কোন সংজ্ঞা দেয়নি। এটা শুধু এ কারণে যে, আল-কুরআন যাদের সম্বোধন করেছে তারা সুদের সাথে ছিল অতিপরিচিত। তারা সবাই জানত সুদ কি। শূকরের গোস্ত, মদ, জুয়া, যেনা-ব্যভিচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ছাড়াই এসব হারাম করা হয়েছে; কারণ এসব পরিভাষা সকলের কাছে সুপরিচিত ছিল এবং কোনটি দ্বারা কোন্ জিনিস বা কাজ বুঝায় সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা ছিল না। রিবার ব্যাপারেও একই অবস্থা ছিল। 'রিবা' পরিভাষা আরববাসীর কাছে মোটেই অপরিচিত ছিল না। তারা পারস্পরিক লেনদেন ক্ষেত্রে হামেশাই এ শব্দ ব্যবহার করত। শুধু আরববাসী নয়; বরং পূর্ববর্তী সকল সমাজেই মানুষ তাদের আর্থিক লেনদেনে 'রিবা' নিত এবং দিত। রিবার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কারও মধ্যেই কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি ছিল না। আমরা ইতিপূর্বে সূরা আন-নিসার আয়াত উল্লেখ করেছি। এ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা ইহুদীদের ভর্ৎসনা করেছেন; কারণ তাদের সুদ খেতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা সুদ খেয়েছে।

এখানে আল্লাহ 'রিবা' বলে যে লেনদেনকে বুঝিয়েছেন, সূরা আলে ইমরান ও সূরা আল-বাকারাতে উল্লেখিত 'রিবা' দ্বারা সেই একই লেনদেনকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ইহুদীদের জন্য যে 'রিবা নিষিদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য সেই একই 'রিবা' নিষিদ্ধ।

বাইবেলে রিবা

৩৭. সুদের উক্ত নিষেধাজ্ঞা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে এখনও বিদ্যমান আছে। বাইবেল থেকে কয়েকটি অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো:

তোমরা তোমাদের ভাইকে সুদে ধার দেবে না; অর্থের সুদ, খাদ্য-সামগ্রীর সুদ, এবং অন্য যে কোন জিনিস, যা সুদে ধার দেওয়া হয়, তার সুদ। (Deuteronomy, ২৩:১৯)

প্রভু, আপনার তাবুতে স্থান পাবে কে? আপনার পবিত্র পর্বত গিরিতে কে বাস করবে? সে, যে ন্যায় পথে চলে, এবং পূণ্যের কাজ করে এবং সর্বান্তকরণে সত্য কথা বলে। যে তার অর্থ সুদে খাটায় না, অথবা নিরীহ নিরপাধীদের কাজ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে না (Psalms, 15:1,2,5)

যে কেউ সুদ এবং অন্যায় উপার্জনের দ্বারা তার সম্পদ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে, সে তা নিজের জন্য পুঞ্জিভূত করে যা দরিদ্রদের দুর্দশা বাড়ায়" (Proverbs 28:8)

www.pathagar.com

অতঃপর আমি বিবেকের সাথে বুঝাপড়া করেছি, এবং সম্ভ্রান্তদের ভর্ৎসনা করেছি এবং তাদের নীতি-ব্যবস্থাকেও, এবং তাদের বলেছি, তোমরা জবরদস্তি সুদ আদায় কর, তার সব ভাই থেকে এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে এক মহাসমাবেশের ব্যবস্থা রেখেছি" (Nehemiah 5:7)

যে সুদে ধার দেয় না, অথবা কোন বৃদ্ধি গ্রহণ করে না, সে অন্যায়পরতা থেকে তার হাতকে সংযত করেছে, সে মানুষে মানুষে সত্য সুবিচার কার্যকর করেছে, সে আমার ছায়ায়/পথে চলেছে এবং সত্যের জন্য আমার সুবিচার রক্ষা করেছে। সে ন্যায়পরায়ণ, সে অবশ্যই বাঁচবে, বললেন সদাপ্রভু (Ezekiel 18:8)

"এখানে তারা রক্তপাতের জন্য উপঢৌকন গ্রহণ করেছে, সুদ খেয়েছে এবং বৃদ্ধি গ্রহণ করেছে, তারা লোভাতুর ও স্বার্থপর হয়ে প্রতিবেশীদের নির্যাতন করে সম্পদ অর্জন করেছে, এবং আমাকে ভুলে গেছে, বললেন সদাপ্রভু (Ezekiel 22:12)

৩৮. ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে প্রদত্ত ঋণের আসলের ওপর যে অতিরিক্ত ধার্য আদায় করে তাই হচ্ছে সুদ। বাইবেলের উল্লেখিত অংশে সুদ শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'রিবা' শব্দটিও এই একই অর্থ প্রকাশ করে। কারণ সূরা আন-নিসাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের জন্য 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

মুফাস্‌সীরদের মতে সুদের সংজ্ঞা

৩৯. এ ছাড়া হাদীসে 'রিবা' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জাহেলিয়াতের যুগে আরবে প্রচলিত সুদী লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের ভিত্তিতে প্রাথমিক যুগের মুফাস্‌সীরগণ পরিষ্কার ভাষায় 'রিবার' সংজ্ঞা দিয়েছেন।

৪০. ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (মৃ: ৩৮০ হি:) তাঁর বিখ্যাত তফসীর আহ্‌কামুল কুরআনে নিম্নে উল্লেখিত ভাষায় 'রিবা'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

আরববাসীরা ঋণের আসলের ওপর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বা দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ দিত। এটাকেই তারা 'রিবা' বলে জানত এবং এই 'রিবা'র লেনদেনেই তারা অভ্যস্ত ছিল।[১২]

৪১. আরবদের মধ্যে প্রচলিত উপরোক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে উক্ত তফসীরকার সুদের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্ন ভাষায়:

জাহেলিয়াত যুগের 'রিবা' হচ্ছে, কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রদত্ত ঋণের আসলের ওপর ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দেয় নির্ধারিত অতিরিক্ত।"[১৩]

www.pathagar.com

৪২. প্রখ্যাত তফসীরকার ইমাম ফখরউদ্দীন আল-রাযি জাহেলী যুগের 'রিবা' সম্পর্কে বলেছেন:

জাহেলিয়াতের যুগে 'রিবা' আল-নাসিয়া সর্বজনে ছিল সুপরিচিত ও স্বীকৃত। অর্থাৎ তারা অর্থ ধার দিত এবং মাসিক ভিত্তিতে একটা নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত আদায় করত; কিন্তু আসল ঠিক থাকত। অতঃপর মেয়াদ শেষ হলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে আসল ফেরত চাইতো। ঋণগ্রহীতা আসল ফেরত দিতে না পারলে ঋণদাতা আসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করত এবং মেয়াদ বাড়িয়ে দিত। এটাই হচ্ছে 'রিবা' যা জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা লেনদেন করত।[১৪]

ইবনে আদিল আল-দিমাস্কী তাঁর বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ আল-লুবাব-এ 'রিবা' সম্পর্কে অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রিবা আল-জাহেলিয়াতের বিস্তারিত বিবরণ

৪৩. পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞ কাউন্সেল জনাব রিয়াযুল হাসান জিলানী আমাদের নিকট যুক্তি উথাপন করেছেন যে, আল-কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' হচ্ছে জাহেলিয়াতের যুগে প্রচলিত এক বিশেষ ধরনের লেনদেন যেখানে ঋণ প্রদানকালে ঋণের আসলের ওপর কোন অতিরিক্ত ধার্য করা হতো না। তবে পরবর্তীতে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ঋণগ্রহীতা যদি আসল ফেরত দিতে ব্যর্থ হতো, তাহলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে দুটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করত -হয় ঋণগ্রহীতা তৎক্ষণাৎ আসল ফেরত দেবে; অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি করার বিনিময়ে সে আসলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। বিজ্ঞ কাউন্সিলের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু জাহেলী যুগে প্রথম ঋণ প্রদানকালে ঋণের আসলের উপর কোন অতিরিক্ত ধার্য করা হতো না, সেহেতু ঋণ প্রদানকালে মূল চুক্তিতে অতিরিক্ত ধার্য করার শর্ত করা হলে তা 'রিবা আল্-কুরআন-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। বরং তা হয় 'রিবা আল-ফদল' এর আওতাভুক্ত; আর 'রিবা আল' ফদল হারাম নয়, মকরূহ (অপছন্দনীয়, বিধেয় নয়) (Detested, not advisable)।

৪৪. উল্লেখিত যুক্তির সমর্থনে বিজ্ঞ কাউন্সেল মুফাস্সীরদের বর্ণিত বেশ কয়েকটি হাদীস তুলে ধরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরির আত-তাবারি'র কথা বলেছেন। আত-তাবারি মুজাহিদের সূত্রে জাহেলী যুগে প্রচলিত 'রিবা' সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন :

জাহেলী যুগে কোন ব্যক্তি ঋণদাতার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করত। অতঃপর সে ঋণদাতাকে বলতো, আমি এতো এতো পরিমাণ বেশী দেবো, আমাকে আরও সময় দেওয়া হোক।[১৫]

www.pathagar.com

৪৫. আল-কুরআনের তফসীরকারদের অনেকেই সুদ সম্পর্কে অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। জনাব রিয়াযুল হাসান জিলানী দেখিয়েছেন যে, এসব হাদীসের কোথাও ঋণ প্রদানকালে ঋণের আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা হয়েছে এমন কথা বলা হয়নি। বরং এসব হাদীসে কেবল এটাই লক্ষ্য করা যায় যে, ঋণ পরিশোধের জন্য প্রদত্ত মেয়াদ শেষ হবার পরই অতিরিক্ত প্রদান বা ধার্য করা হতো। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল-কুরআন সেই 'রিবা'কে (অতিরিক্তকে) নিষিদ্ধ করেছে যা মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার বিনিময়ে দাবী করা হতো। সুতরাং ঋণ প্রদানকালে কৃত প্রাথমিক চুক্তিতে আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে সে বৃদ্ধি 'রিবা' আল-কুরআন-এর মধ্যে পড়ে না।

৪৬. বিজ্ঞ কাউন্সিলের উল্লেখিত যুক্তি আমাদের কাছে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ তফসীরের সূত্রগুলো একটু গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, জাহেলী যুগে ঋণের আসলের ওপর বিভিন্নরূপে অতিরিক্ত ধার্য করা হতো। প্রথমত, ঋণদাতা ঋণ প্রদানের সময়ই তার আসলের ওপর অতিরিক্ত দাবী করত এবং ঋণগ্রহীতা অতিরিক্ত দিতে রাজী হলে ঋণদাতা উক্ত বর্ধিত পরিমাণসহ আসল ফেরতের শর্তে ঋণ প্রদান করত। ইমাম আল-জাসাস-এর আহকামুল কুরআন থেকে ইতিপূর্বে উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে একথাই বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঋণদাতা মাসে মাসে একটা নির্ধারিত অতিরিক্ত আদায় করত; কিন্তু ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আসলের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকত। ইমাম আল-রাযি এবং ইবনে আদিল একথাই বলেছেন যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৭. 'রিবা' ধার্য করার তৃতীয় যে ধরন প্রচলিত ছিল তার বিবরণ দিয়েছেন মুজাহিদ; বিজ্ঞ কাউন্সল সেটিই উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ইবনে জরির কাতাদার সূত্রে এ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

জাহেলী যুগের 'রিবা' ছিল এমন এক লেনদেন যেখানে কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত দিনে দাম পরিশোধ করার শর্তে কোন পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করত, অতঃপর দাম পরিশোধের নির্ধারিত তারিখে ক্রেতা যদি দাম পরিশোধে ব্যর্থ হতো, তাহলে বিক্রেতা তার বাকী-পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিত এবং পরিশোধের জন্য আরও সময় দিত।[২৬]

৪৮. আল-সুয়ূতি ফারাবীর সূত্র থেকেও এই একই কথা বলেছেন:

তারা (আরবরা) ভবিষ্যতে দাম পরিশোধ করার শর্তে বাকীতে পণ্য ক্রয় করত, অতঃপর দাম পরিশোধের নির্ধারিত দিনে বিক্রেতা তার পাওনার পরিমাণ বর্ধিত করে সময় বাড়িয়ে দিত।[২৭]

২৬ # সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

www.pathagar.com

৪৯. উপরের উদ্ধৃতি থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যেসব লেনদেনে পাওনাদার পাওনা পরিশোধের দিন অতিরিক্ত ধার্য করত সেসব লেনদেন আসলে ঋণ ছিল না, বরং প্রথমে তা ছিল ভবিষ্যতে দাম পরিশোধের শর্তে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়। এসব ক্ষেত্রে বিক্রেতা দাম বাকী থাকার কারণে বিক্রয়কালেই পণ্যের দাম বেশী ধার্য করত। অতঃপর ক্রেতা নির্ধারিত সময়ে উক্ত দাম পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিক্রেতা মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময়ে পাওনার পরিমাণ আবারও বাড়িয়ে দিত। মুজাহিদও তাঁর আলোচনায় এই বিশেষ ধরনের লেনদেনের কথাই উল্লেখ করেছেন; আর সে কারণেই তিনি এরূপ পাওনা বুঝানোর জন্য ঋণ (কর্জ) শব্দ ব্যবহার করেননি; বরং এজন্য তিনি দেনা (দাইন) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর সাধারণত ক্রয়-বিক্রয়ের দেনা-পাওনা থেকে 'দাইন' সৃষ্টি হয়।

৫০. আল-কুরআনের মুফাস্সীরগণ এ ধরনের 'রিবা'র কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআনের নিম্ন আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়েই তাঁরা এরূপ করেছেন। আয়াতটি হচ্ছে:

তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো রিবার মতই (২:২৭৫)।

৫১. কাফেরদের এই বক্তব্যে উপরে উল্লেখিত বিশেষ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। কাফেরদের আপত্তি এইখানে যে, 'যখন আমরা বাকীতে বিক্রী করি তখন দাম পরে পাওয়া যাবে এই কারণে বিক্রয়মূল্য বাড়িয়ে ধার্য করি, আর তা বৈধ বিক্রয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু বাকী বিক্রয় করার পর দেনাদার যদি নির্ধারিত সময়ে দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তখন পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি করলে তাকে বলা হয় 'রিবা'। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির ধরন একই রকম'। প্রখ্যাত মুফাস্সীর ইবনে আবি হাতিম সাঈদ ইবনে যুবায়েরের সূত্রে মক্কার কাফেরদের এ আপত্তির কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

আমরা বিক্রয়কালে বেশী দাম ধার্যকরি বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পাওনার পরিমাণ বাড়াই, কথা একই। উভয়ই সমান। কুরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াতে কাফেরদের এই আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়ছে। বলা হয়েছে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো রিবার মতোই।[১৮]

৫২. আবু হাইয়ান[১৯] তাঁর আল বাহ্‌র আল্ মুহীত গ্রন্থেও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আল-কুরআনের কয়েকজন মৌলিক ব্যাখ্যাকারও একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৫৩. উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর আসল বৃদ্ধি দু'ধরনের অবস্থায় করা হতো। প্রথম অবস্থায় মূল লেনদেন হতো ক্রয়-বিক্রয়, অর্থাৎ কোন জিনিস বাকীতে বিক্রয় করা হতো; অতঃপর ক্রেতা নির্ধারিত সময়ে দাম

www.pathagar.com

পরিশোধে ব্যর্থ হলে পাওনা দামের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। কাতাদা, ফারাবী, সাঈদ ইবনে যুবায়ের প্রমুখ এ কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় মূল লেনদেন হতো ঋণ। অতপর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করতো, কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত আসলের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকতো। অতঃপর ঋণদাতা আসল ফেরত চাইতো, ঋণগ্রহীতা আসল ফেরত দিতে না পারলে ঋণদাতা পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধির বিনিময়ে পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত। ইমাম রাজি ও ইবনে আদিল এ কথা উল্লেখ করেছেন। ৪২ ও ৪৩ প্যারায় তাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৫৪. উপরে উল্লিখিত যুক্তি থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞ কাউন্সেল জনাব রিয়াযুল হাসান জিলানী যেসব লেনদেনের মধ্যে সুদের নিষেধাজ্ঞা সীমিত বলে উল্লেখ করেছেন, আসলে আল-কুরআনে ঘোষিত 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞা সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে যে, জাহেলী যুগে সুদ লেনদেনের বিভিন্ন ধরন ছিল; আর তদানীন্তন আরববাসীরা এই সবগুলো পন্থাতেই সুদ লেনদেন করতো। তবে সকল প্রকার সুদী লেনদেনের সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হচ্ছে, দেনার আসলের ওপর একটি অতিরিক্ত পরিমাণ ধার্য করা । কখনও বাকী ক্রয়-বিক্রয় থেকে দেনা সৃষ্টি হতো; কখনও বা ঋণ বা কর্জ থেকে দেনা সৃষ্টি হতো। অনুরূপভাবে অতিরিক্ত পরিমাণও কখনও মাসিক ভিত্তিতে আদায় করা হতো এবং মেয়াদ শেষে আসল ফেরত নিতো। কখনও আবার অতিরিক্ত ও আসল এক সাথে মেয়াদ শেষে পরিশোধ করা হতো। এসব ক্ষেত্রেই বর্ধিত অতিরিক্ত অংশকে বলা হতো 'রিবা'; কারণ 'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থই হচ্ছে 'বৃদ্ধি'। এসব কিছু বিবেচনা করে আল-কুরআনের প্রখ্যাত মুফাস্সীর আবু বকর আল-জাসাস সুদের (রিবার) সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্ন ভাষায়:

জাহেলিয়াতের যুগের 'রিবা' (সুদ) হচ্ছে, ঋণের আসলের ওপর ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দেয় সেই অতিরিক্ত যার বিনিময়ে ঋণদাতা নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ প্রদান করত।[২০]

৫৫. আধুনিক কালে উদ্ভাবিত সুদ হারাম হওয়ার বিরুদ্ধে আদালতের সামনে বিভিন্ন ধরনের যেসব যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে, এখন আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব।

রিবার ধারণা অস্পষ্ট হওয়া সম্পর্কে হযরত ওমরের উক্তি

৫৬. হাবীব ব্যাংক লিমিটেডের বিজ্ঞ কাউন্সেল জনাব আবু বকর চুন্দ্রিগড় বিচারপতি মরহুম কাদীর উদ্দীন আহমদ রচিত একটি লেখা আদালতে উপস্থাপন করেছেন। ১৯৯৪ সালের ১২ আগস্টের 'দৈনিক ডন'-এ লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে বিচারপতি

www.pathagar.com

কাদীর উদ্দীন আহমদ বলেছেন যে, আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'রিবা' শব্দের অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট। এর সঠিক অর্থ কারও জানা নেই; এমনকি নবীর (সা.) বিশিষ্ট কতিপয় সাহাবাও এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হননি। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত ওমরের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত উক্তিতে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, *আল-কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে 'রিবা'র আয়াত। এ আয়াতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা আমাদেরকে জানানোর পূর্বেই নবী করীম (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। সুতরাং তোমরা 'রিবা'কে বর্জন কর এবং এ ব্যাপারে সন্দেহজনক যা কিছু আছে তাও পরিহার কর।* আপীলকারীদের অনেকেই তাদের আপীল-দরখাস্তেও একই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। শুধু তাই নয়, কোন কোন আপীলকারী 'রিবা'র আয়াতকে 'মুতাশাবিহাত' (যেসব আয়াতের অর্থ অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক অথবা যার অর্থ বুঝতে মানুষ অক্ষম) আয়াত বলে অভিহিত করেছেন। এরা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদেরকে 'মুহ্‌কামাত' অর্থাৎ যেসব আয়াতের অর্থ স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, কেবল সেসব আয়াত অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে, 'মুতাশাবিহাত' আয়াতের নয়। আর 'রিবা'র আয়াত মুতাশাবিহাত-এর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তাদের মতে 'রিবা'র আয়াত অনুসরণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

৫৭. আসলে এ যুক্তি বিভ্রান্তিমূলক। কারণ সূরা আল-বাকারায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুদ পরিহার করতে ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী এবং দয়া-করুণার আঁধার। এটা কি করে সম্ভব যে, আল্লাহ এমন এক কাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যে কাজের আসল ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে কারই জ্ঞান নেই। এ কথা কি চিন্তা করাও সম্ভব! বস্তুতপক্ষে 'মুতাশাবিহাত' শব্দটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা আলে ইমরানের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে 'মুতাশাবিহাত' বলে আল-কুরআনের দুই ধরনের আয়াতকে বুঝানো হয়েছে; প্রথমত, বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত কিছু শব্দকে বলা হয়েছে 'মুতাশাবিহাত'। এ শব্দসমূহের সঠিক ও নিশ্চিত অর্থ কারও জানা নেই, যেমন আলিফ-লাম-মীম-রা, ইত্যাদি। কিন্তু এই শব্দসমূহের সঠিক অর্থ না জানার কারণে মুসলমানদের জীবন পরিচালনায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না; কারণ এসব শব্দের মাধ্যমে শরীয়তের কোন বিধি-বিধান বা নীতি দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, 'মুতাশাবিহাত' বলতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কতিপয় গুণবাচক শব্দকে বুঝানো হয়েছে। এসব গুণাবলীর প্রকৃত স্বরূপ কি তা মানুষের পক্ষে বুঝা বা ধারণা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, আল-কুরআনের বেশ কয়টি আয়াতে (যেমন ৩:৭৩, ৫:৬৩, ৪৮:১০) 'আল্লাহর হাত'-এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর হাতের ধরন-প্রকৃতি কি তা কেও জানে না, আর তা জানা জরুরীও নয়। কারণ এটা জানার ওপর ইসলামী শরীয়তের বাস্তব

www.pathagar.com

কোন বিষয় নির্ভরশীল নয়। কিন্তু কিছু লোক এসব মুতাশাবিহাতের প্রকৃত অর্থ বের করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে থাকে যদিও এটা বের করা তাদের দায়িত্ব নয়। আল্লাহতা'য়ালা তাঁর এসবগুণের প্রকৃত অর্থ জানার নামে কল্পণাপ্রসূত আলোচনা ও বিতর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। বস্তুত, বাস্তবে অনুসরণযোগ্য শরীয়তের কোন বিধি-বিধানের সাথে 'মুতাশাবিহাত' বিষয়ের কোন সম্পর্কও নেই। অপরপক্ষে শরীয়তের বাস্তব কোন বিধানকে কখনও 'মুতাশাবিহাত' আখ্যায়িত করা হয়েছে তারও কোন নজীর পাওয়া যায় না। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহতা'য়ালা মানুষের ওপর এমন কোন বোঝা চাপান নাই যা বহন করার ক্ষমতা তাদের নেই, বা তিনি এমন কোন কাজের নির্দেশ দেন নাই যা করার সাধ্য তাদের নেই বা যার ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই (২:২৩৩)। 'রিবা'র প্রকৃত অর্থ যদি মানুষের জানা না-ই থাকত, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মুসলমানদের ওপর 'রিবা' পরিহার করে চলার বাধ্য-বাধকতা আরোপ করতেন না। কিন্তু 'রিবা'র গুণাহ সম্পর্কে আল্লাহ আল-কুরআনে যেরূপ কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন, অন্য কোন পাপের বেলায় তা করেননি। সূরা আল-বাকারার সুদের আয়াত পাঠ করলে সহজেই বুঝা যায় যে, 'রিবা'কে অতি সাংঘাতিক পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ পাপের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য যারা সুদী কারবার থেকে বিরত থাকবে না তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা আর কোন গুণাহ্‌র বেলায় বলা হয়নি।

রিবা আল-ফদলের বর্ণনা

৫৮. হযরত ওমর (রা)-এর উক্তি সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এখানে এ কথা উল্লেখ করা জরুরী যে, আল-কুরআন ইতিপূর্বে উল্লেখিত জাহেলী যুগে প্রচলিত সকল প্রকার 'রিবা'কে হারাম ঘোষণা করেছে। 'রিবা' ঋণের লেনদেন থেকে উদ্ভূত হোক বা বাকী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার দেনার ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত হোক অথবা এসব 'রিবা' আরোপ করার পদ্ধতি যাই হোক না কেন, আল-কুরআন একে নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু 'রিবা'র আয়াতসমূহ নাযিলের পর রাসূল (সা.) আরও কিছু এমন লেনদেনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যাকে আরববাসীরা ইতিপূর্বে 'রিবা' বলে জানতো না। মহানবী (সা.) উপলব্ধি করলেন যে, আরবে বিদ্যমান বাণিজ্যিক পরিবেশে এমন কিছু দ্রব্য বিনিময় (Barter) প্রথা চালু আছে যা মানুষকে 'রিবা'র দিকে ঠেলে দিতে পারে অথবা এর মাধ্যমে 'রিবা'র অনুপ্রবেশ ঘটার আশংকা রয়েছে। আরববাসীরা সাধারণত গম, যব, খেজুর ইত্যাদি দ্রব্যকে অর্থের ন্যায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত এবং এর দ্বারা অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করত। নবী (সা.) এসব

www.pathagar.com

পণ্যকে অর্থের মতই বিনিময়ের এক একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করলেন এবং এসবের লেনদেন/বিনিময় ক্ষেত্রে নিম্নের বিধানটি জারি করলেন:

সোনার পরিবর্তে সোনা, রূপার পরিবর্তে রূপা, গমের পরিবর্তে গম, যবের পরিবর্তে যব, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর এবং লবণের পরিবর্তে লবণের বিনিময় অবশ্যই সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে। এরূপ বিনিময়ে যে বেশী দিবে অথবা বেশী নিবে (যে কোন পক্ষ) সেই সুদী কারবারে লিপ্ত হবে।[১]

৫৯. এর অর্থ হচ্ছে যদি গমের সাথে গমের বদল করতে হয়, তাহলে উভয় পক্ষকে পরস্পর সমান সমান পরিমাণের গম বিনিময় করতে হবে। যদি এক পক্ষ বেশী পরিমাণ গম দেয় এবং অপর পক্ষ তার চেয়ে কম পরিমাণ গম দেয় তাহলে সে লেনদেন সুদী লেনদেনে পর্যবসিত হবে। কারণ তদানীন্তন আরবের গোত্রীয় ব্যবস্থায় এ দ্রব্যগুলো অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং এক কিলোগ্রাম গমের সাথে দেড় কিলোগ্রাম গমের বিনিময়, আর এক দিরহামের সাথে দেড় দিরহামের বিনিময়কে একই ধরনের বিনিময় বলে গণ্য করা হতো। নবী করীম (সা.) একে রিবা বলে ঘোষণা করেছেন; 'রিবা আল-জাহেলিয়াত' এই 'রিবা'কে বুঝায় না। সুতরাং এ ধরনের 'রিবা'কে বলা হয়েছে 'রিবা আল-ফদল' বা 'রিবা আল-সুন্নাহ'।

৬০. উল্লেখ্য যে, নবী (সা.) 'রিবা আল-ফদল' নিষিদ্ধ করেছেন এবং এক্ষেত্রে কেবল ছয়টি পণ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত হাদীসে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, এ বিধান কেবল উল্লেখিত ছয়টি পণ্যের বিনিময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি অন্যান্য পণ্যের বিনিময়কালেও তা প্রযোজ্য হবে। যদি অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয়, তাহলে সে পণ্যগুলো কি কি? এসব প্রশ্ন নিয়ে ফক্বীদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। কাতাদাহ, তাউস প্রমুখ প্রাথমিক যুগের ফক্বীগণ মনে করেন, এ বিধান উল্লেখিত ছয়টি পণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু প্রাথমিক কালের অন্যান্য ফক্বীদের মতে সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও উক্ত আইন প্রযোজ্য হবে। অতঃপর উল্লিখিত ছয়টি পণ্যের সাধারণ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং নিরূপিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নীতি বা মানদণ্ড উদ্ভাবন এবং সেই নীতি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে কোন কোন পণ্যের পরস্পর বিনিময় ক্ষেত্রে উক্ত আইন প্রযোজ্য হবে তা নির্দিষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে ফক্বীদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের মতে হাদীসে উল্লেখিত ছয়টি পণ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এগুলো ওজন অথবা পরিমাপ করে লেনদেন করা হয়। সুতরাং অন্যান্য যে সব দ্রব্য ওজন বা পরিমাপ করে বেচাকেনা করা হয় সে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেও হাদীসে বর্ণিত আইন প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এসব দ্রব্যের মধ্যে একই জাতের দ্রব্য যদি পরস্পর বদল (Bartered Transaction) করা হয় তাহলে তা পরিমাণে

www.pathagar.com

সমান সমান ও উপস্থিত নগদ লেনদেন ভিত্তিতে হতে হবে। কিন্তু ইমাম আল-শাফীর মতে হাদীসে বর্ণিত ছয়টি পণ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলোর কয়েকটিকে প্রধান খাদ্য দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়; আর কয়েকটিকে সর্বজনস্বীকৃত বিহিত মুদ্রা (universal legal tender) রূপে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন গম, যব, খেজুর ও লবণ হচ্ছে খাদ্য দ্রব্য; আর স্বর্ণ ও রৌপ্য হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম বা মুদ্রা। সুতরাং ইমাম শাফীর মতে যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য এবং বিনিময়ের সকল মাধ্যম বা মুদ্রার ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত উক্ত বিধান প্রয়োগ করতে হবে। ইমাম মালিকের মত আবার একটু ভিন্নতর। তিনি বলেছেন, হাদীসে উল্লেখিত পণ্য ছয়টির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, হয় এগুলো খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় অথবা এগুলোকে মজুদ করে রাখা যায়। সুতরাং ইমাম মালিকের অভিমত হচ্ছে, খাদ্য জাতীয় সকল পণ্য এবং যেসব পণ্য মজুদ করা যায় তা সবই হাদীসে উল্লেখিত ছয়টি পণ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং সেই ছয়টি পণ্যের ন্যায় এসব পণ্য-সামগ্রীর ওপরও একই আইন প্রযোজ্য হবে।[২২]

৬১. নবী করীম (সা.) সুনির্দিষ্ট ছয়টি পণ্যের কথা হাদীসে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য সকল পণ্যের ক্ষেত্রে কি হবে বা অন্যান্য পণ্য এ ছয়টির মধ্যে গণ্য হবে কি না, নবী (সা.) তা স্পষ্ট করে বলেননি। এ কারণেই এ বিষয়ে ফক্বীগণ বিভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

হজরত ওমরের উক্তির সঠিক অর্থ

৬২. সাইয়্যেদেনা ওমর (রা) এই প্রেক্ষাপটেই বলেছেন যে, উল্লেখিত মত পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়ার পূর্বেই নবী করীম (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, হজরত ওমর কেবল উক্ত হাদীসে বর্ণিত 'রিবা আল-ফদল' সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন; যে রিবাকে আল-কুরআনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং জাহেলী যুগে আরবরা তাদের দ্রব্য বিনিময়ে নয় বরং ঋণ লেনদেন কালে যে রিবা লেনদেন করত, সে মূল 'রিবা' সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। সহীহ আল-বুখারী এবং মুসলিম শরীফে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বুখারীর উল্লেখিত হাদীসটি নীচে পেশ করা হলো: *আমার এই কামনা ছিল যে, তিনটি বিষয়ে আমাদের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে নবী (স) যেন আমাদের ছেড়ে চলে না যান। বিষয় তিনটি হচ্ছে : দাদার উত্তরাধিকার, কালালার (এমন ব্যক্তি যে না তার পিতা রেখে গেছে, না কোন পুত্র) উত্তরাধিকার এবং 'রিবা'র সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়।*[২৩]

www.pathagar.com

৬৩. এছাড়া হজরত ওমর (রা) অন্য আর এক বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর ওপরে উল্লেখিত উক্তির ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন:

নিশ্চয়ই তোমাদের ধারণা আছে যে, 'রিবা' সংক্রান্ত অনেক বিষয়েই (সমস্যাই) আমরা জানি না; সকল অধিবাসীসহ মিশরের মালিক হওয়ার চেয়েও এসব বিষয়ে জানা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। 'রিবা' সংক্রান্ত এমন কিছু লেনদেন আছে যা কারো অজানা থাকা উচিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ, রৌপ্যের বিনিময়ে বাকীতে স্বর্ণ ক্রয় করা এবং এমন ফল ক্রয় করা যা এখনও গাছে রয়েছে, যার বর্ণ এখনও হলুদ এবং যা পাকে নাই (যার বিনিময়ে পরিমাপ ছাড়াই অনুরূপ ফল প্রদান করা হয়)।[২৪]

৬৪. হজরত ওমরের (রা.) এ ব্যাখ্যা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে, প্রথমত, 'রিবা' বিষয়ে তাঁর যাবতীয় উদ্বেগ ছিল 'রিবা ফদল' এর সাথে সংশ্লিষ্ট, আল-কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা নাসিয়া' সম্পর্কে নয়। দ্বিতীয়ত, 'রিবা ফদলের' ক্ষেত্রেও এমন কিছু লেনদেন আছে যেগুলো হাদীসে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এসব লেনদেন সম্পর্কেও ওমর (রা.) মোটেই দ্বিধান্বিত ছিলেন না; বরং তিনি মাত্র কয়েকটি লেনদেনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, যেগুলো উক্ত হাদীসে বা নবী করীমের (সা.) অন্য কোন হাদীসে পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয়নি।

৬৫. উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটা আপত্তি উঠতে পারে। সেটি হচ্ছে এই যে, ইবনে মাজা বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *হজরত ওমর (রা.) বলেছেন, রিবার আয়াতই হয়েছে আল-কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। সুতরাং এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।*[২৫] এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, হজরত ওমরের সন্দেহ 'রিবা ফদল'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না; বরং তাঁর সন্দেহ ছিল সেই 'রিবা'র সাথে সংশ্লিষ্ট যে 'রিবা'কে আল-কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে মাজা বর্ণিত হজরত ওমরের উল্লেখিত উক্তির সূত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সূত্র যতটা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ইবনে মাজা বর্ণিত উক্ত হাদীসের সূত্র ততটা বিশুদ্ধ নয়। ইবনে মাজা বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন সাঈদ ইবনে আরুবাহ। তাঁর সম্পর্কে হাদীস বিশারদদের অভিমত হচ্ছে, তিনি এমন একজন বর্ণনাকারী যিনি হাদীস সমূহের বিষয় সম্পর্কে তালগোল পাকিয়ে ফেলতেন।[২৬] (এক হাদীসের বিষয় নিয়ে অন্য এক হাদীসে মিশিয়ে ফেলতেন)। ইতোপূর্বে আমরা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হজরত ওমরের বক্তব্য হুবহু তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলীসহ উদ্ধৃত করেছি। এ হাদীসগুলো অত্যন্ত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত এবং বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাও নির্ভরযোগ্য। তাঁদের

www.pathagar.com

কেউ একথা বলেননি যে, হজরত ওমর একথা বলেছেন যে, 'রিবা'র আয়াত আল-কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। তবে এমন হয়ে থাকতে পারে যে, সাঈদ ইবনে আবি আরুবাহর মত বর্ণনাকারী হজরত ইবনে আব্বাসের (রা) বক্তব্যকে হজরত ওমরের (রা) বক্তব্য বলে ভুল করেছেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অথবা এমনও হতে পারে যে, সাঈদ ইবনে আবি আরুবাহ তাঁর নিজের মতকেই ওমরের (রা) বক্তব্য বলে ভুল করেছেন। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। অতঃপর একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, রাসূলের (সা.) জীবনের শেষ অধ্যায়ে 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে অথবা আল-কুরআনে 'রিবা'র আয়াত সর্বশেষে নাযিল হয়েছে। সুতরাং হজরত ওমরের উক্তির যথার্থতা নিরূপণে ইবনে মাজা কর্তৃক উদ্ধৃত বিবরণের ওপর নির্ভর করা যায় না। উক্ত আলোচনা থেকে এটাই যথার্থ সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হজরত ওমরের মনে যে সন্দেহ ছিল তা কেবল 'রিবা ফদল' এর বিষয়ে; অন্যথায় 'রিবা আল-কুরআন' বা 'রিবা আল-নাসিয়া'র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয়ও ছিল না।

উৎপাদনশীল ও ভোগ্য ঋণের যুক্তি

৬৬. কতিপয় আপীলকারী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কেবল ভোগ্য ঋণের আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করতে নিষেধ করেছে। তদানীন্তন কালে দরিদ্র লোকেরা তাদের দৈনন্দিন খাওয়া পরার প্রয়োজন পূরণার্থে একান্ত বাধ্য হয়েই ঋণ গ্রহণ করত। এসব গরীব লোকদের ঋণ দেওয়ার পর ঋণের আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা ছিল নিতান্তই অমানবিক ও অন্যায়। তাই আল-কুরআন এর ওপর 'রিবা' ধার্য করা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু নবী করীমের (সা.) জামানায় উৎপাদনশীল ও বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিল না। সুতরাং উৎপাদনশীল ও বাণিজ্যিক ঋণের আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য নিষিদ্ধ করার উদ্দেশে 'রিবা'র আয়াত নাযিল করা হয়নি। অন্য কথায়, উৎপাদনশীল বাণিজ্যিক ঋণ সাধারণত ধনীরাই নিয়ে থাকে। এ ঋণ তারা তাদের ব্যবসার উন্নয়নে খাটায় এবং এর মাধ্যমে প্রভূত মুনাফা অর্জন করে থাকে। দরিদ্রদের ঋণের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করায় যে বে-ইনসাফী ও অমানবিকতা দেখা দেয় এসব উৎপাদনশীল বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে তেমন বে-ইনসাফী ও অমানবিকতার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং কেবল ভোগ্য ঋণের ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্তকেই রিবা বলা হয়েছে। বাণিজ্যিক ঋণের ওপর আরোপিত অতিরিক্তকে নয়।

৬৭. আমরা যথার্থ গুরুত্বের সাথে এ যুক্তিটি পর্যালোচনা করেছি; তাত্ত্বিক বিচারে প্রধানত তিনটি কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রতীয়মান হয়:

www.pathagar.com

ক. লেনদেনের বৈধতা দাতা-গ্রহীতার আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল নয়

৬৮. প্রথমত, আর্থিক অথবা বাণিজ্যিক লেনদেনের বৈধতা ক্রেতা-বিক্রেতার আর্থিক অবস্থার ওপর কখনও নির্ভর করে না; বরং লেনদেনের নিজস্ব প্রকৃতির দ্বারাই এর বৈধতা নিরূপিত হয়ে থাকে। কোন লেনদেন যদি প্রকৃতিগতভাবে বৈধ হয় তাহলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্যই তা বৈধ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। ক্রয়-বিক্রয় একটি বৈধ লেনদেন যার মাধ্যমে বৈধ মুনাফা লাভ করা যায়। ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই হালাল। এতে ক্রেতা ধনী হোক বা দরিদ্র হোক তাতে কিছু আসে যায় না। তেমনি ভাড়া প্রদান একটি বৈধ লেনদেন এবং ভাড়া গ্রহীতা যদি দরিদ্রও হয় তা হলেও তাকে ভাড়ায় দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, যেহেতু ক্রেতা বা ভাড়াগ্রহীতা গরীব সেহেতু মানবিক কারণে তাকে দাম বা ভাড়ার ব্যাপারে কিছু কম ধার্য করা উচিত। কিন্তু কেউ একথা বলতে পারে না যে, তাদের কাছ থেকে মুনাফা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। কোন গরীব লোক যদি রুটিওয়ালার কাছ থেকে রুটি কিনতে চায়, তাহলে কেউ বড় জোর একথা বলতে পারে যে, তার কাছ থেকে বেশী লাভ নেয়া রুটিওয়ালার উচিত নয়; কিন্তু এক্ষেত্রে এ কথা বলার অধিকার কারও নেই যে, উক্ত ক্রেতার কাছে খরচ দামে রুটি বিক্রয় করতে রুটিওয়ালা বাধ্য, খরচ মূল্যের ওপর কোন মুনাফা গ্রহণ করা রুটিওয়ালার জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ এবং এ কাজ করলে সে অবশ্যই দোযখে যাবার যোগ্য হবে। কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে তাহলে ট্যাক্সিওয়ালাকে এ পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে, সে যেন ভাড়া গ্রহীতার দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে তার ভাড়া কিছু কমিয়ে দেয়; কিন্তু সম্পূর্ণ ভাড়া মওকুফ করে দেওয়া বা তার প্রকৃত খরচের চেয়ে বেশী ভাড়া না নেওয়ার জন্য ট্যাক্সিওয়ালাকে বাধ্য করা যাবে না। আর এ কথা বলা যাবে না যে, তা করলে তার উপার্জন সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে এবং তা হবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। রুটিওয়ালা দোকান খুলেছে রুটি বিক্রি করে বৈধভাবে মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্যে; আর এ কারবারটি স্বতই একটি বৈধ কারবার। সে এতে তার পুঁজি বিনিয়োগ করেছে, শ্রম খাটিয়েছে; এজন্য ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন করা তার ন্যায্য অধিকার। ক্রেতা যদি দরিদ্রও হয় তাতে তার এ অধিকারে কোন ব্যত্যয় হতে পারে না। কিন্তু তাকে যদি সকল গরীবের কাছে খরচ দামে রুটি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয় তাহলে তার পক্ষে এ কারবার চালানো সম্ভব হবে না, তার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করাও হবে অসম্ভব। অনুরূপভাবে, একজন ট্যাক্সি চালক যাত্রীদেরকে পরিবহন সেবা প্রদান করে। আর এজন্য সে তার প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে ন্যায্য ভাড়া আদায় করে। এখন এই ট্যাক্সি চালককে যদি সব গরীব লোকদেরকে বিনা ভাড়ায় তার সেবা প্রদানে

www.pathagar.com

বাধ্য করা হয়, তা হলে তার পক্ষে ট্যাক্সি চালানো সম্ভব নয়। এসব কারণে আজ পর্যন্ত একথা কেউ বলেননি যে, গরীবদের নিকট থেকে মুনাফা করা, ফি নেওয়া বা ভাড়া নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। বস্তুতপক্ষে মুনাফা, ফি এবং ভাড়া সম্পূর্ণ বৈধ, যদি সংশ্লিষ্ট কারবার বা লেনদেন বৈধ হয়। সুতরাং বিক্রীত পণ্যসামগ্রী অথবা প্রদত্ত সেবা থেকে যারা উপকৃত হয়, তারা যদি দরিদ্র হয় তা হলেও তাদের কাছ থেকে মুনাফা, ফি বা ভাড়া ধার্য ও আদায় করা বৈধ।

৬৯. অপরদিকে যেসব লেনদেনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাও করা হয়েছে কারবারের নিজস্ব প্রকৃতির ভিত্তিতে, ক্রেতা-বিক্রেতার আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নয়। জুয়া ধনী দরিদ্র সকলের জন্যই হারাম। আবার ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে নেয়া ঘুষ যেমন হারাম, তেমনি দরিদ্র লোকের কাছ থেকে নেয়া ঘুষও হারাম। সুতরাং সত্য কথা হচ্ছে যে, লেনদেনকারীদের বিত্ত-বৈভব বা দারিদ্র্য কোন কারবারকে বৈধ বা অবৈধ বানায় না; বরং লেনদেনের নিজস্ব প্রকৃতির দ্বারাই কারবারের বৈধতা বা অবৈধতা নিরূপিত হয়।

৭০. ঋণগ্রহীতার ওপর সুদ ধার্য করার বিষয়টি এ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। প্রকৃতিগত বিচারে যদি সুদী কারবার বৈধ হয়, তাহলে সুদ ধার্য করা অবশ্যই বৈধ হবে; এতে ঋণগ্রহীতা দরিদ্র হলেও। কিন্তু নিজস্ব প্রকৃতির কারণে যদি সুদী কারবার অবৈধ হয়, তাহলে সুদ ধার্য করা অবশ্যই অবৈধ হবে; এতে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা ধনী দরিদ্র যাই হোক। অনুরূপভাবে ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা যদি প্রকৃতিগতভাবে অবৈধ হয়, তাহলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে মুনাফা নেয়া অবৈধ হবে; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় যদি এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে হালাল হয়ে থাকে তাহলে ক্রেতা ধনী হলেও তার ওপর মুনাফা ধার্য করা যেমন বৈধ, তেমনি ক্রেতা দরিদ্র হলেও তা অবশ্যই বৈধ হবে। কিন্তু সুদী কারবার ও ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার মধ্যে এভাবে পার্থক্য করার কোন যৌক্তিকতা নেই যে, ঋণগ্রহীতা ধনী হলে তার ওপর সুদ ধার্য করা বৈধ; অপরদিকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধনী-দরিদ্র সকলের ওপরই মুনাফা ধার্য করা বৈধ। বস্তুত ঋণগ্রহীতা দরিদ্র হলেই কেবল সুদ নিষিদ্ধ, এরূপ ধারণা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালার পরিপন্থি; কারণ কারবারের বৈধতা ও অবৈধতা বিচার করা হয় কারবারের নিজস্ব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, সংশ্লিষ্ট পক্ষের পরিচিতি দ্বারা নয়।

৭১. তাছাড়া দারিদ্র্য বিষয়টি একটি আপেক্ষিক বিষয়। দারিদ্র্যের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, ধনীদের ওপর সুদ ধার্য করা বৈধ, আর দরিদ্রদ্যের কাছ থেকে সুদ নেয়া বৈধ নয়, তাহলে সুদ মওকুফ-যোগ্য দারিদ্র্যের যথার্থ স্তর নিরূপণ করবে কে? কতিপয় আপীলকারী দাবী করেছেন যে, ভোগ্য ঋণের ওপর সুদ ধার্য

www.pathagar.com

করা বৈধ নয়। তাদের দাবী অনুসারে ঋণের উদ্দেশ্যকে যদি বৈধ ও অবৈধ সুদের মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং ভোগের জন্য গৃহীত ঋণকে সুদের আওতামুক্ত রাখা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য-সামগ্রী থেকে শুরু করে বিলাসদ্রব্য পর্যন্ত বহু ধরনের ভোগ হতে পারে। এমনকি, ভোগের সীমা যদি জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী পর্যন্ত বেধে দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রেও তা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কেউ দাবী করতে পারে, ব্যক্তিগত যানবাহন দৈনন্দিন জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক; সুতরাং তাকে গাড়ী কেনার জন্য সুদমুক্ত ঋণ দেয়া উচিত। আবার, বাসস্থান হচ্ছে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। বাসস্থান নির্মাণ বা ক্রয় করার উদ্দেশ্যে গৃহীত মিলিয়ন মিলিয়ন টাকার ওপর সুদ ধার্য করা যাবে না। কারণ এ ঋণ হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য ঋণের শ্রেণীভুক্ত। অন্যদিকে একজন বেকার লোক যদি রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মালক্রয় করার জন্য সামান্য কয়েকশত টাকা ধার করে, তাহলে তার ওপর সুদ ধার্য করা আইনত বৈধ বিবেচিত হবে, কেননা তার এ ঋণ ভোগ্য ঋণের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

৭২. উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে সুদের বৈধতা নিরূপিত হতে পারে না; তেমনি ঋণের উদ্দেশ্যের ওপরও সুদের বৈধতা ভিত্তিশীল নয়। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে ভোগ্য ঋণ ও উৎপাদনশীল ঋণের মধ্যে পার্থক্য করা হবে কারবার ক্ষেত্রে প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালার পরিপন্থি।

খ. আল-কুরআনে ঘোষিত নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতি

৭৩. উল্লেখিত যুক্তি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞাসূচক আয়াতে ভোগ্য ঋণ এবং বাণিজ্যিক ঋণের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া সুদ সংক্রান্ত হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারের কোথাও এরূপ পার্থক্যের ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, রাসূলের (সা.) যুগে বাণিজ্যিক ঋণ প্রচলিত ছিল না তাহলেও তা 'রিবা'র ধারণার সাথে নতুন শর্ত সংযোজনের ন্যায্যতা প্রমান করে না। 'রিবা'র ধারণা পূর্ব থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কুরআনে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের *কাছে* এ ধারণা ছিল সুপরিচিত ও স্পষ্ট। আল-কুরআন 'রিবা' নিষিদ্ধ করেছে সাধারণ ভাষায়, যার মধ্যে সব ধরনের রিবাই শামিল রয়েছে, কুরআন নাযিলের সময়ে তা প্রচলিত থাক বা না থাক। বস্তুত আল-কুরআন যখন কোন লেনদেনকে নিষিদ্ধ করে তখন সে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা সে লেনদেনের কোন বিশেষ ধরনকে বুঝায় না; বরং লেনদেনের মৌলিক ধারণাকে নিষিদ্ধ করাই হয় এরূপ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য। যেমন, মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে- এর দ্বারা কেবল সে কালে প্রচলিত কোন বিশেষ ধরনের মদ নিষিদ্ধ করা হয়নি; বরং মদ

www.pathagar.com

জাতীয় বস্তুকে হারাম করা হয়েছে; কারও পক্ষে একথা বলা সংগত নয় যে, রাসূলের (সা.) যুগে যেসব মদ চালু ছিল না সেসব মদের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। এমনিভাবে জুয়া নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যও এটা নয় যে, কেবল সেকালে প্রচলিত জুয়া পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা সীমিত থাকবে; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ধরনের জুয়াই এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। শুভবুদ্ধির অধিকারী কোন লোক একথা বলতে পারে না যে, আধুনিক জুয়া এ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনায় দেখিয়েছি যে, তদানীন্তন আরববাসীরা 'রিবা' বলতে কি বুঝতো এবং নবী করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম 'রিবা'র কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এতে আমরা বলেছি যে, ঋণ বা দেনার আসলের ওপর নির্ধারিত অতিরিক্ত অংশকে বলা হয়েছে 'রিবা'। আলোচনায় আমরা এটাও দেখিয়েছি যে, নবীর (সা.) যুগে বিভিন্ন ধরনের 'রিবা' প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এর ধরন পরিবর্তিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এতে আরও পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু কান লেনদেনে যতক্ষণ পর্যন্ত 'রিবা'র উল্লিখিত মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে তত ক্ষণ তা অবশ্যই নিষিদ্ধ গণ্য হবে।

গ. কুরআন নাযিলের সময় ব্যাংক ব্যবস্থা ও উৎপাদনশীল ঋণ না থাকার যুক্তি

৭৪. তৃতীয়ত, একথা বলা ঠিক নয় যে, 'রিবা' নিষিদ্ধ করার সে যুগে বাণিজ্যিক ঋণ বা উৎপাদনশীল ঋণের প্রচলন ছিল না। এ বিষয়ে বর্তমানে যথেষ্ট প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া গেছে যা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাণিজ্যিক ও উৎপাদনশীল ঋণ আরবদের কাছে মোটেই অপরিচিত ছিল না; বরং ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরবর্তীতেও উৎপাদনশীল কাজে ঋণ দেওয়া হতো।

৭৫। বাণিজ্যিক ও ব্যাংকিং লেনদেন খৃস্টিয় ১৭ শতকের উদ্ভাবন- আধুনিক কালের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা এই ধারণার ভ্রান্তি উদ্ঘাটন করে দিয়েছে।[২৭] এসব গবেষণা থেকে জানা যায় যে, খৃস্টের জন্মের ২০০০ বছর পূর্বেও ব্যাংকিং লেনদেন চালু ছিল। ব্যাংকের ইতিহাস আলোচনায় এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা ব্যাংকিং লেনদেনের গোড়ার ইতিহাস তুলে ধরেছে। উক্ত প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করা হলো:

হিব্রুদের মত যাজক শাসিত জাতিগুলোর (Pastoral Nations) মধ্যে ঋণদাতা মহাজনের (Money lenders) অস্তিত্ব থাকলেও আধুনিক দৃষ্টিকোণের বিচারে যথার্থ ব্যাংক ব্যবস্থা তখনও ছিল না। কিন্তু ব্যাবিলনবাসীরা খৃস্টপূর্ব ২০০০ অব্দেই এরূপ পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল। তবে তখনও পর্যন্ত এর পেছনে ব্যক্তি উদ্যোগ ছিল না; বরং সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আনুষঙ্গিক কাজ হিসেবেই ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। মিশরের উপাসনালয়গুলোর ন্যায়

www.pathagar.com

ব্যাবিলনের গীর্জাগুলোও ব্যাংকে পরিণত হয়েছিল। ব্যাবিলনের একটি চুক্তিপত্রে লেখা আছে, "এডাড্রিমেনির পুত্র মাস-শামাক (Mas Schamach) ওয়ারাড এনলিল-এর কন্যা সূর্যদেবী আমাত-শামাক-এর কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাপের রৌপ্য (The shekels of silver) ধার করেছিল। সে সূর্য দেবের (Sun Gods) সুদ প্রদান করবে। ফসল তোলার সময়ে সে সুদসহ সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করবে।" একথা সত্য যে, দেবী আমাত-শামাক গীর্জা কর্তৃক নিযুক্ত ও স্বীকৃত এজেন্ট ছিল। সন্দেহ নাই যে, আজকের যুগে আমরা যাকে নেগোশিয়েবল বাণিজ্যিক পত্রাবলি সে যুগের কাঁদামাটি নির্মিত খোদাই করা ফলকও আসলে তাই ছিল। একই সময়ের অন্য একটি চুক্তিপত্র থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। চুক্তিপত্রটিতে লিখা আছে, "তারিবামের পুত্র ওয়ারাদ ইলিশ ইদ্দাতুমের কন্যা সূর্যদেবী ইলটানীর নিকট থেকে সুর্যদেবের পাল্লার ওজনে এক শেকেল রৌপ্য ধার নিয়েছে। এ অর্থ তিল ক্রয় করায় খাটানো হবে। ফসল তোলার মৌসুমে তখনকার বাজার দর অনুসারে এ পত্রবাহককে তিল প্রদানের মাধ্যমে এ ঋণ পরিশোধ করা হবে।"[৮]

৭৬. অতঃপর এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার উক্ত প্রবন্ধে কিভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বেসরকারী কারবার প্রতিষ্ঠানে রূপ নিল তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। খৃ: পূ: ৫৭৫ অব্দ পর্যন্ত ব্যাবিলনে 'দি ইজিবি ব্যাংক অব ব্যাবিলন' নামে একটি ব্যাংক ছিল। এই ব্যাংকের রেকর্ড-পত্র থেকে জানা যায়, এই ব্যাংক এর গ্রাহকদের ক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতো, ফসলের ওপর ঋণ প্রদান করত এবং ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরূপ ক্ষেতের ফসল অগ্রিম জামানত (attaching) রাখত। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে মূল্যবান জিনিস জমা রেখে এবং তার স্বাক্ষর নিয়ে ঋণ প্রদান করত; এছাড়া সুদ প্রদানের শর্তে আমানত (deposit) গ্রহণ করত। প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে, খৃস্টের কয়েক শত বছর পূর্বে গ্রীস, রোম, মিশর ইত্যাদি দেশেও অনুরূপ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল। এসব ব্যাংক সুদের শর্তে অর্থ জমা নিত; সুদের ভিত্তিতে তা ধার দিত; ব্যাপকভাবে ঋণপত্র (L.C.) ও আর্থিক পত্রাদি ব্যবহার করত ও এসবের ব্যবসা করত।

৭৭. অতি নিকট অতীতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুর‍্যান্ট খৃস্টের পাঁচশত বছর পূর্বে গ্রীসে যে ব্যাংকিং লেনদেন চালু ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, দার্শনিকগণও সুদের নিন্দা করেছেন; কিন্তু এতদসত্ত্বেও গ্রীসে ব্যাংক ছিল। তিনি লিখেছেন:

কিছু লোক গীর্জার কোষাগারে তাদের অর্থ জমা রাখত। গীর্জাগুলো ব্যাংক হিসেবে কাজ করত এবং বেসরকারী ব্যক্তি ও রাজ্যসমূহকে সহজ ও মধ্যমমানের সুদের

www.pathagar.com

হারে ঋণ প্রদান করত। ডেলফিতে অবস্থিত এপোলো গীর্জাটি কোন কোন দিক থেকে সকল গ্রীসবাসীর জন্য ছিল একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক স্বরূপ। বেসরকারী ব্যাংকগুলো সরকারকে ঋণ দিত না, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এক রাজ্য অন্য রাজ্যকে ধার প্রদান করত। ইতিমধ্যে পঞ্চম শতকে গ্রীসে অর্থ বিনিময়কারীদের (Money changer) উদ্ভব ঘটে। তারা তাদের টেবিলে (Trapeza) বসে অর্থ জমা গ্রহণ করত এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করত। এসব ঋণের ওপর ঋণের ঝুঁকির ভিত্তিতে শতকরা ১২ থেকে ৩০ ভাগ হারে সুদ ধার্য করা হতো। এমনিভাবে অর্থ বিনিময়কারীগণ ব্যাংকারে পরিণত হলো। তবে প্রাচীন গ্রীসের শেষ নাগাদ তারা তাদের সেই প্রাথমিক উপাধি 'টেবিলে মানুষ' (Trapezite) সংরক্ষণ করেই চলেছে। অর্থ বিনিময়কারীগণ নিকট প্রাচ্য থেকে তাদের কর্মকৌশল শিখেছে, এর পরিশুদ্ধি ও উন্নয়ন সাধন করেছে এবং রোমে চালান করেছে; আর রোম উত্তরাধিকার সূত্রে তা আধুনিক ইউরোপের কাছে হস্তান্তর করেছে।

পারস্য যুদ্ধের পর পরই থেমিস্টোকলস করিনথিয়ান ব্যাংকার ফিলোস্টেফানাস-এ সত্তর ট্যালেন্টস (৪২০,০০০ মার্কিন ডলার) জমা করে। আজকের দিনে রাজনৈতিক অভিযাত্রীগণ যেমন বিদেশে তাদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে রাখে এটাও ছিল ঠিক তেমনি। উপাসনালয় থেকে পৃথক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাংকিং এর এটাই হচ্ছে প্রথম নমুনা। এ শতাব্দীর শেষ দিকে এন্টিসথেনস এবং আরকেস্ট্রাটাস গ্রীক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাংকের গোড়াপত্তন করেন। ট্র্যাপেজিটাই-এর মাধ্যমে মুদ্রা সঞ্চালন হতো অধিকতর অবাধ ও দ্রুততর এবং তা পূর্বের তুলনায় বেশী কার্য সম্পাদন করত। এর ফলে সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা এথেনীয় বাণিজ্যের সৃজনশীল সম্প্রসারণ সম্ভব করে তুলেছিল।[১৯]

৭৮. আরবে ইসলাম অতি নিকটবর্তী সময়েও বাইজেন্টাইন সম্রাট শাসিত সিরিয়ায় সকল প্রকার শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি খাতে সুদ ভিত্তিক ঋণের প্রচলন ছিল। এই ঋণ এতটা ব্যাপক ছিল যে, সম্রাট জাস্টিনিয়ানকে (৫২৭-৫৬৫ খৃ:) বিভিন্ন ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করে আইন জারি করতে হয়েছিল। গীবন সম্রাট জাস্টিনিয়ান ঘোষিত উক্ত আইনের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখিছেন, উক্ত আইনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঋণের ওপর ৪%, সাধারণ লোকদের ঋণের ওপর ৬%, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে ৮% এবং নৌ-বীমাকারীদের ঋণের ওপর ১২% সুদ ধার্য করার বিধান ছিল। গীবনের নিজের ভাষায় :

Persons of illustrious rank were confined to the moderate profit of four percent; six was pronounced to be ordinary and legal

www.pathagar.com

standard of interest; eight was allowed for the convenience of manufacturers and merchants; twelve was granted to nautical insurers[৩০]

৭৯. উপরের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, রোম সাম্রাজ্যে বাণিজ্যিক ঋণ ব্যাপকভাবে চালু ছিল যার জন্য এসব ঋণের সুদ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে পৃথক আইন করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। আর সম্রাট জাস্টিনিয়ান এ আইন জারি করেছিল আরবে নবী করীমের (সা.) জন্মের মাত্র কয়েক বছর পূর্বে। (সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের মৃত্যু হয় ৫৬৫ খৃ:, আর নবী (সা.) জন্মগ্রহণ করেন ৫৭০ খৃ:): এটা অবধারিত যে, এ আইন জারি হবার পর থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তা কার্যকর ছিল। অপরদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্যতম সভ্য নগরী সিরিয়ার সাথে আরববাসী, বিশেষ করে, মক্কার অধিবাসীদের সুদীর্ঘ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখবো যে, আরবের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলো তাদের কতিপয় পণ্য সিরিয়ায় বয়ে নিয়ে যেতো এবং অপর কতিপয় দ্রব্য-সামগ্রী সিরিয়া থেকে নিজ দেশে নিয়ে আসত। বস্তুত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে আরবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এত বেশী জড়িয়ে পড়েছিল যে, আরবের সর্বত্র বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মুদ্রিত দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) এবং দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাধারণ মুদ্রা হিসেবে চালু হয়ে গিয়েছিল।[৩১] এজন্য কবিরা অনেকেই দিনারকে সীজারের মুদ্রারূপে চিত্রিত করেছেন। কুছায়ের উয্যাহ, আরবের একজন বিখ্যাত কবি; তিনি বলেছেন, *নারীর উজ্জ্বল ঝলসানো দৃষ্টি যেন হেরাক্লিয়াসের লাল কাঁচা স্বর্ণমুদ্রার প্রতি ঝুঁকে আছে।*[৩২]

৮০. ইবনে আল-আনবারী আর একজন কবির লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছেন *সীজারের দেশে দিনার নির্মিত ও উজ্জ্বল হয়েছে।*[৩৩]

৮১. সমসাময়িক কালের কতিপয় লেখকের দাবী হচ্ছে যে, আরবী মুদ্রার নাম (দিরহাম, দিনার ও ফালস), মূলত এই নামের সাথে সংগতিশীল গ্রীস অথবা ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।[৩৪] গোটা মুসলিম বিশ্বের মুদ্রা হিসেবে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এই মুদ্রাই চালু ছিল হিজরী ৭৬ সাল পর্যন্ত; অতঃপর আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাঁর নিজস্ব দিনার চালু করেন।[৩৫]

৮২. গোটা আরবের সাথে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের উল্লেখিত বাণিজ্যিক ও আর্থিক ঘনিষ্ট সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এটা কি করে বলা যেতে পারে যে, রোম সাম্রাজ্যের জাঁকালো ঋণের কারবার সম্পর্কে আরববাসী ছিল সম্পূর্ণ অনবহিত ও অজ্ঞ! বস্তুত আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কেবল সিরিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না (পরে আলোচনায় আসবে); বরং তাদের বাণিজ্য ইরাক, মিশর ও ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। আরববাসী

www.pathagar.com

এসব দেশের কায়কারবার ও লেনদেনের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিল এবং তাদের সুদী লেনদেন সম্পর্কে আরবদের আদৌ কোন অজ্ঞতা ছিল না। আবদুল্লাহ বিন সালাম (মদীনার স্থানীয় অধিবাসী) আবু বুরদাকে (ইরাকে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং মদীনায় সফরে এসেছিলেন) যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় যে, আরবরা বাজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সুদী কারবার সম্পর্কে কেবল জানতো তাই নয়; বরং এ ব্যাপারে তারা ছিল পূর্ণ সচেতন। আব্দুল্লাহ বিন সালাম আবু বুরদাকে এই মর্মে সতর্ক করেছেন যে, আবু বুরদা এমন এক দেশে বাস করেন যেখানে 'রিবা'র (সুদ) প্রচলন অতি ব্যাপক; সুতরাং অন্যের সাথে লেনদেন কালে তাঁকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে; অন্যথায় নিজের অজ্ঞাতেই তিনি সুদের সাথে জড়িয়ে পড়বেন।[৩৬] হজরত উবাই ইবনে কাব তাঁর ছাত্র যির বিন হুবাইশকে অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩৭]

আরবে বাণিজ্যিক সুদ

৮৩. এবার খোদ আরব উপদ্বীপে আসা যাক। এসত্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল আরবদের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কায়কারবার। বিশেষ করে, মক্কা ছিল অনুর্বর শুষ্ক মরুভূমি ও পাহাড়ের সমষ্টি; সেখানে পানির অভাব ছিল খুবই প্রকট। এ অঞ্চল কৃষি কাজের জন্য মোটেই উপযোগী ছিল না। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল এর অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আর আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য কেবল তাদের নিজ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা তাদের চারপাশের সকল দেশে নিজেদের পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করত এবং সেসব দেশের পণ্য নিজ দেশে আমদানি করত। এ উদ্দেশ্যে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো সিরিয়া, ইরাক, মিশর, ইথিওপিয়া ইত্যাদি দেশ সফর করত। আরবীয় কাফেলার বাণিজ্যিক অভিযানের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুবের (আ.) (জ্যাকব বা ইসরায়েল) আমল থেকেই এরূপ অভিযানের সিলসিলা চলে আসছে। আল-কুরআনে হযরত ইউসুফের (আ.) (জোসেফ) ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফকে (আ.) তাঁর ভাইয়েরা একটি কূপে ফেলে দিয়েছিল। এক বাণিজ্যিক কাফেলা হযরত ইউসুফকে কূপ থেকে উদ্ধার করে এবং মিশরে নিয়ে বিক্রি করে দেয়।[৩৮] ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, এই কাফেলা ছিল হযরত ইসমাইলের (আ.) সন্তানদের নিয়ে গঠিত। তাঁরা বাণিজ্যিক অভিযানে তাদের পণ্য নিয়ে মিশর যাচ্ছিল। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে:

এবং তারা রুটি খেতে বসেছিল: এবং তারা চোখ তুলে তাকাল এবং দেখতে পেল গিলাড থেকে ইসমাইলীদের একটি দল আসছে; তাদের উটের পিঠে ছিল নানা ধরনের মসলা, সুগন্ধী ও মস্তকি। তারা এসব পণ্য মিশর নিয়ে যাচ্ছিল।[৩৯]

www.pathagar.com

৮৪. এই আরব কাফেলা প্রাচীন আরবের কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত মিশরে মসলা, সুগন্ধী ও মস্তকি রপ্তানি করতে যাচ্ছিল। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, আরবরা প্রথম থেকে কতটা দুঃসাহসী উদ্যোগ গ্রহণে (Entrepreneurship) অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

৮৫. এটাই স্বাভাবিক যে, পরবর্তীতে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তারা ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কতটা সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং তা কি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল ঐতিহাসিকগণ তা বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়; আর তার প্রয়োজনও নেই।[৪০] তবে আরব জাতি ছিল বণিকের জাতি। আরবদের ইতিহাস পড়েছেন এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা সম্ভব নয়। আরবদের জীবনে বাণিজ্য কাফেলা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে, আল-কুরআনে এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করা হয়েছে (সূরা কুরায়েশ); সূরায় আল্লাহ নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, কুরাইশরা শীতকালে ইয়েমেনে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় যে বাণিজ্য অভিযান চালায়, তা হচ্ছে তাদের জন্য আল্লাহর নেয়ামত; আল্লাহর পবিত্র কাবা'র সেবাইত হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের এ নেয়ামত দান করেছেন। আল-কুরআন এখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে 'ইলা'ফ' শব্দ ব্যবহার করেছে; এর দ্বারা আসলে আরব কুরাইশদের সাথে অন্যান্য জাতি ও গোত্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে।[৪১] আরবের বাণিজ্য কাফেলাগুলোর আকারও হতো বিশাল বিশাল। বদরের যুদ্ধের সময়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত বাণিজ্য কাফেলার আকার থেকে এ বিষয়ে ধারণা করা যেতে পারে। এ কাফেলায় মোট এক হাজার উট ছিল; তারা শতকরা ১০০ ভাগ মুনাফা অর্জন করে ফিরে আসছিল (প্রতি ১ দিনারে ১ দিনার)।[৪২]

৮৬. এটা স্পষ্ট যে, এত বড় কাফেলা কোন একক ব্যক্তির মালিকানায় সংগঠিত হতে পারেনি; বরং এটা ছিল সমগ্র গোত্রের সমবেত উদ্যোগ। যৌথ মূলধনী কোম্পানির ন্যায় গোত্রের সকল সদস্য এতে অর্থ যোগান দিয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন:

কুরায়েশ গোত্রে এমন কোন পুরুষ বা এমন কোন নারী ছিল না যার কাছে এক মিশকাল সোনা ছিল এবং সে উক্ত কাফেলায় তা দান করেনি।[৪৩]

৮৭. কেবল আবু সুফিয়ানের কাফেলাকেই উক্ত পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা হয়েছিল তা নয়; বরং বড় বড় সকল কাফেলার জন্য অর্থসংস্থানে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো।

৮৮. আরবে বিদ্যমান উল্লিখিত বাণিজ্যিক পরিবেশ সামনে রাখলে কারও পক্ষে এটা কল্পনা করা সম্ভব নয় যে, আরবরা বাণিজ্যিক ঋণের সাথে সুপরিচিত ছিল না; অথবা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ঋণ ব্যবস্থা কেবল ভোগ্য ঋণ পর্যন্তই সীমিত ছিল। কেবল

www.pathagar.com

ধারণা বা অনুমান নয়, বরং এ ব্যাপারে যথেষ্ট বাস্তব প্রমাণ রয়েছে যে, আরবরা বাণিজ্যিক ও উৎপাদন কাজের প্রয়োজনে ধারে অর্থ গ্রহণ করত। নীচে এর কয়েকটি উদাহরণ সংক্ষেপে পেশ করা হলো:

ক) ড. জাওয়াদ আলী জাহেলী যুগের আরবদের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তার এ গবেষণা বিশ্বের শিক্ষা জগতে (Academic world) বিশেষভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। তিনি তদানীন্তন আরবের বাণিজ্য কাফেলাসমূহের অর্থের উৎস বিশ্লেষণ করে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:

মক্কার বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, কোন একক ব্যক্তি বা কোন এক পরিবারের অর্থ দ্বারা একটি কাফেলার পুঁজি গঠিত হয়েছে এমন কখনও হয়নি; বরং বিভিন্ন পরিবারের ব্যবসায়ীরা ছিল সেই সব ব্যক্তি যাদের নিজের অর্থ ছিল অথবা যারা অন্যের কাছ থেকে অর্থ ধার করত। তারা সকলে মিলে একটি কাফেলার পুঁজি যোগান দিত; এটা আশায় যে, এর দ্বারা তারা বিপুল মুনাফা লাভ করবে।[৪৪]

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, অন্যান্য উৎসের সাথে বাণিজ্যিক ঋণের দ্বারাও আরবের বাণিজ্য কাফেলাকে অর্থ যোগান দেয়া হতো।

খ) সকল তফসীর গ্রন্থেই সূরাতুল বাকারার সুদের আয়াতের পটভূমি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় সব তফসীরেই একথা বলা হয়েছে যে, আরবের বিভিন্ন গোত্র পরস্পর সুদ ভিত্তিক ঋণ লেনদেন করত। উদাহরণ স্বরূপ ইবনে জরির আত্-তাবারি বলেছেন, *বনু আমর গোত্র বনু আল-মুগীরা গোত্রের কাছ থেকে সুদ আদায় করত এবং বনু আল-মুগীরা তাদের সুদ প্রদান করত।*[৪৫]

এই ঋণ ব্যক্তি পর্যায়ের ঋণ নয়; এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কাছ থেকে এ ঋণ নেয়নি; বরং সামষ্টিক সত্তা হিসেবে এক গোত্র অপর গোত্রের নিকট থেকে অর্থ ধার নিত। উপরে আমরা বলেছি যে, আরবের গোত্রগুলো যৌথ মূলধনী কোম্পানির ন্যায় সমবেতভাবে তাদের বাণিজ্যিক উদ্যোগ গ্রহণ করত এবং যৌথভাবে কাফেলার পুঁজি যোগান দিত। সুতরাং এক গোত্র অপর গোত্রের কাছ থেকে কেবল ভোগের জন্যই ঋণ গ্রহণ করত এমন নয়; বরং তারা তাদের বাণিজ্য কাফেলার পুঁজি যোগান দেয়ার উদ্দেশ্যে অবশ্যই বাণিজ্যিক ঋণও লেনদেন করত।

গ) সূরাতুর রূমের অন্তর্ভুক্ত সুদ সংক্রান্ত (৩০:৩৯) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (এই রায়ের ১৭ নং প্যারায় উদ্ধৃত করা হয়েছে) ইবনে জরির আততাবারি প্রাথমিক কালের কয়েকজন প্রখ্যাত তফসীরকারের মতামত উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, জাহেলী

www.pathagar.com

যুগে কিছু লোক অন্য কিছু লোককে অর্থ যোগান দিত যাতে গ্রহীতাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়; উক্ত আয়াতে এরূপ লেনদেনের কথাই বলা হয়েছে। ইবনে জরির এই মতকে সমর্থন করেছেন এবং এর পক্ষে ইবনে আব্বাসের (রা.) নিম্নে উল্লেখিত বক্তব্য তুলে ধরেছেন:

তুমি কি সেই লোককে দেখনি, যে অপর কাউকে বলে যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে অর্থ যোগান দিব, অতঃপর তাকে অর্থ দেয়? সুতরাং এটা আল্লাহর কাছে বাড়ে না, কারণ সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাকে দেয় না; বরং তার সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য দেয়।[৪৬]

এ প্রসঙ্গে তিনি ইবরাহীম আল নখয়ীর নিম্নলিখিত বক্তব্যটিও উদ্ধৃত করেছেন:
জাহেলী যুগে কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়দের অর্থ দিতো তার সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য।[৪৭]

এটা স্পষ্ট যে, গ্রহীতার সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে অর্থ প্রদান করার অর্থ হচ্ছে, গ্রহীতা এই অর্থ লাভ করার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করবে এবং এভাবে তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ইববাহীম আল-নখয়ীর উল্লেখিত বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আরবীয় সমাজে উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ঋণ লেনদেন করার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং তা এতটা ব্যাপক ছিল যে, উল্লিখিত মুফাস্সীরদের মতে, এ প্রেক্ষিতেই সূরা আররূমের উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়েছে।

ঘ) রাসূলে পাকের (সা.) হাদীসেও বাণিজ্যিক ঋণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ, আল-বাযযার এবং আল-তাবারানি আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেছেন,

শেষ বিচারের দিন সর্বশক্তিমান আল্লাহ একজন ঋণগ্রহীতাকে ডাকবেন। সে আল্লাহর সামনে এসে দাঁড়াবে: তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদমের সন্তান, এই ঋণ তুমি কেন গ্রহণ করেছিলে এবং কি কারণে তুমি লোকদের অধিকার হরণ করেছিলে? সে বলবে, হে আমার প্রভু, তুমি জানো যে, আমি এ ঋণ গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু খাওয়া বা পান করা বা পোষাক পরিধান বা অন্য কোন কাজে তা ব্যবহার করিনি; বরং আগুন আমার সর্বস্ব ভস্ম করে দিয়েছিল, অথবা চোর আমার সব কিছু লুটে নিয়েছিল অথবা ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়েছিলাম। আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমিই হচ্ছি সর্বশ্রেষ্ঠ। আজ তোমার পক্ষ থেকে আমি তা পরিশোধ করব।[৪৮]

হাদীসে উল্লেখিত 'ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলাম' কথা থেকে বুঝা যায় যে, এ ঋণগ্রহীতা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করেছিল; অতঃপর কারবারে লোকসানের দরুন সে সব কিছু খোয়া দিয়েছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণের ধারণা স্বয়ং নবীর (সা.) কাছেও অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল।

www.pathagar.com

ঙ) ইমাম বুখারী (রা.) এ বিষয়ে একটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসরাঈলীয় এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে, সে অন্য আর একজনের নিকট থেকে এক হাজার দিরহাম ধার নিয়ে সমুদ্র যাত্রায় বের হয়েছিল।[৪৯] অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এ ঋণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল।[৫০]

তাছাড়া এমন হতে পারে না যে, এত বিরাট অংকের ঋণ স্বাভাবিক ভোগ্য প্রয়োজনে নেয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, ঋণগ্রহীতা এ অর্থ নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করেছিল। এ অর্থের দ্বারা ঋণগ্রহীতা এত বিপুল মুনাফা অর্জন করেছিল যে, মেয়াদ শেষে সে ঋণদাতাকে সমপরিমাণ অর্থ ফেরত পাঠাল। প্রথম প্রেরিত এ অর্থ ঋণ দাতার হাতে পৌঁছেনি মনে করে ঋণগ্রহীতা দ্বিতীয়বার আবার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে বলে প্রস্তাব করল। কিন্তু ঋণদাতা তাকে জানালো যে, ইতিপূর্বে প্রেরিত সাকুল্য অর্থ সে পেয়েছে, আর দ্বিতীয়বারের এ অর্থ সে গ্রহণ করবে না।
এ ব্যাপারে আর একটি উদাহরণ এমন রয়েছে যাতে নবী করীম (সা.) নিজে বাণিজ্যিক ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন।

চ) উপরে বাণিজ্য কাফেলার অর্থায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যক্তি পর্যায়েও যে আরবে বাণিজ্যিক ঋণ লেনদেন প্রথা প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে বহু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তার কয়েকটি নীচে পেশ করা হলো:

১. আবু লাহাব রাসুলুল্লাহর (সা.) আপন চাচা। সে ছিল রাসূলের (সা.) জানী শত্রুদের অন্যতম; কিন্তু সে নিজে বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়নি। কারণ ছিল, সে অসি বিন হিসামকে সুদের ভিত্তিতে চার হাজার দিরহাম ঋণ দিয়েছিল; কিন্তু সে এ ঋণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়। আবু লাহাব এ ঋণের বিনিময়ে অসি বিন হিসামকে ভাড়া করে তার বদলে বদরের যুদ্ধে পাঠায়। সেকালে চার হাজার দিরহাম কোন ছোট অংক ছিল না যা কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য ধার করতে পারে। এটা নিশ্চিত যে, এ ঋণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল এবং কারবারে ভাল করতে না পেরে ঋণগ্রহীতা দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল।[৫১]

২. বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ এবং ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) ছিলেন রাসূলের (সা.) বিত্তশালী সাহাবাদের একজন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত লোক। এজন্য লোকেরা তাঁর কাছে তাদের অর্থ-সম্পদ আমানত হিসেবে জমা রাখতে চাইত। কিন্তু তিনি আমানত হিসেবে কারও অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না তা তাকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হতো। আর ঋণ হিসেবে তাঁকে অর্থ দেওয়া জমাকারীদের জন্য ছিল অধিকতর লাভজনক, কারণ ঋণ হিসেবে

www.pathagar.com

দেওয়া হলে হযরত যুবায়ের যে কোন অবস্থায় তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন; কিন্তু আমানতের বেলায়, আমানতি সম্পদ যদি চুরি, আগুণ ইত্যাদি কারণে বিনষ্ট হয় তাহলে তা ফেরত দানে আমানতদারকে বাধ্য করা যায় না। লোকেরা হযরত যুবায়েরের (রা.) কাছে যে অর্থই ঋণ হিসেবে জমা রাখত, যুবায়ের (রা.) তা কারবারে বিনিয়োগ করতেন বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক যেভাবে লোকদের কাছ থেকে ধারে অর্থ নিয়ে তা বিনিয়োগ করে। যুবায়ের (রা.) প্রায় একই পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণ ও বিনিয়োগ করতেন। *(অবশ্যই সুদের ভিত্তিতে নয়-অনুবাদক)* ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন যে, হযরত যুবায়েরের (রা.) মৃত্যুকালে ঋণদাতাদের কাছে তাঁর দেনার পরিমাণ হিসাব করা হয়েছিল। এতে তাঁর দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দুই মিলিয়ন দুইশত হাজার দিরহাম; এই সাকূল্য অর্থই বাণিজ্যিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।[৫২]

৩. ইবনে সা'দ বলেছেন, হযরত ওমর (রা.) সিরিয়ায় একটি বাণিজ্য কাফেলা প্রেরণ করার মনস্থ করেছিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফের (রা.) কাছ থেকে চার হাজার দিরহাম ধার নিয়েছিলেন।[৫৩]

৪. ইবনে জরির লিখেছেন, উতবার কন্যা এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ হযরত ওমরের (রা.) নিকট থেকে তাঁর ব্যবসার জন্য চার হাজার দিরহাম ঋণ নিয়েছিল। এ অর্থ সে তার কারবারে খাটিয়েছিল। এর দ্বারা সে মাল ক্রয় করে কল্ব গোত্রের বাজারে বিক্রয় করত।[৫৪]

৫. আল-বায়হাকি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়ার্দ (রা.) হযরত ওসমানের (রা.) কাছ থেকে সাত হাজার দিরহাম ধার করেছিলেন।[৫৫] এ ঋণ কোন দরিদ্র ব্যক্তি কর্তৃক তার প্রয়োজন পূরণার্থে গ্রহণ করা হয়নি। কারণ ঋণগ্রহীতা হযরত মিকদাদ (রা.) একজন বিত্তশালী সাহাবা ছিলেন; বদরের যুদ্ধে তিনিই ছিলেন একমাত্র অশ্বারোহী সৈনিক; আর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তার কৃষি ফসল ক্রয় করেছিলেন এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে।[৫৬]

৬. হযরত ওমর যখন খৃস্টান ঘাতকের মরণাঘাত খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রদের ডেকে ঋণদাতাদের কাছে তাঁর দায়-দেনার হিসাব করতে বললেন। হিসাব শেষে দেখা গেল, তার দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮০,০০০ দিরহাম।[৫৭] কিছু লোক হযরত ওমরকে (রা.) বায়তুল মাল থেকে ঋণ গ্রহণ করে উক্ত দেনা পরিশোধ করা, আর বায়তুল মাল থেকে গৃহীত এ ঋণ তার সম্পদ বিক্রি করে ওয়াশিল করা যাবে বলে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত ওমর এ পরামর্শ বাতিল করে দিলেন এবং তাঁর পুত্রদের তাঁর সম্পদ থেকে দেনা পরিশোধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[৫৮] ৮০,০০০ দিরহামের এই বিরাট অংকের ঋণ যে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য গৃহীত হয়নি তা নিশ্চিত।

www.pathagar.com

৭. ইমাম মালিক তাঁর আল-মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ওমরের (রা.) দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও উবায়েদুল্লাহ জিহাদে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইরাক গিয়েছিলেন। জিহাদ থেকে ফেরার পথে তাঁরা বসরা নগরীর গভর্নর আবু মূসা আল-আশয়ারীর (রা.) সাথে সাক্ষাৎ করলেন। গভর্নর তাদের বললেন যে, তাদের মাধ্যমে তিনি মদীনায় হযরত ওমরের (রা.) কাছে কিছু সরকারী অর্থ পাঠাতে চান। তিনি পরামর্শ দিলেন, *আমি যদি এ অর্থ তোমাদেরকে আমানত হিসেবে না দিয়ে ঋণ (কর্জ) হিসেবে দিই তা হলে এ অর্থের পুরো ঝুঁকি ও দায় দায়িত্ব বর্তাবে তোমাদের ওপর; আর তা নিরাপদে মদীনায় হযরত ওমরের (রা.) কাছে পৌঁছে যাবে। আর তোমাদের (আবদুল্লাহ ও উবায়েদুল্লাহ) জন্যও হবে তা লাভজনক। কারণ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করার পর, এ অর্থ দ্বারা তোমরা ইরাক থেকে পণ্যসামগ্রী কিনে মদীনায় নিয়ে বিক্রি করবে। অতঃপর আসল টাকা হযরত ওমরকে (রা.) বুঝিয়ে দেওয়ার পর তোমাদের একটা ভাল মুনাফা থেকে যাবে।* আব্দুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ গভর্নরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করলেন। মদীনায় পৌঁছে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করার পর তাঁরা ঋণের আসল অর্থ হযরত ওমরের (রা.) কাছে পৌঁছালেন। হযরত ওমর (রা.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আবু মূসা সেনাবাহিনীর সকলকেই অনুরূপ ঋণ দিয়েছেন কি না? তাঁরা নেতিবাচক জবাব দিলেন। হযরত ওমর বললেন, *আমার সাথে তোমাদের সম্পর্কের কারণেই আবু মূসা তোমাদের এ ঋণ দিয়েছেন; সুতরাং আসল তো ফেরত দেবেই, এ ঋণের দ্বারা অর্জিত মুনাফাও তোমাদের বায়তুলমালে ফেরত দিতে হবে।* উবায়েদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আপত্তি জানিয়ে বললেন, এ সিদ্ধান্ত ন্যায়সংগত নয়; কারণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্যসামগ্রী যদি পথে বিনষ্ট হতো তাহলে এ ঋণের সম্পূর্ণ দায় তাঁদের ওপর বর্তাতো এবং সকল অবস্থায়ই তাদেরকে আসল ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হতো: সুতরাং তারা যে মুনাফা অর্জন করেছে এটা তাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু হযরত ওমর তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন এবং অর্জিত মুনাফা বায়তুল মালে ফেরত দেওয়ার জন্য বলতে থাকলেন। এসময়ে সেখানে উপস্থিতদের মধ্য থেকে একজন হযরত ওমরকে (রা.) পরামর্শ দিলেন যে, তাদের কাছ থেকে সাকুল্য মুনাফা ফেরত দেওয়ার দাবী না করে তিনি বরং এ লেনদেনকে মুদারাবা (মুনাফায় অংশীদারী) কারবারে রূপান্তর করতে পারেন এবং এভাবে অর্জিত মুনাফার অর্ধেক অংশ আব্দুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহকে দিয়ে বাকী অর্ধেকটা বায়তুল মালে জমা করতে পারেন। হযরত ওমর (রা.) এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সে মোতাবেক মুনাফা ভাগ করেন।[৫৯] এখানে এটা স্পষ্ট যে, আব্দুল্লাহ ও উবায়েদুল্লাহকে প্রদত্ত ঋণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছিল এবং শুরু থেকেই ব্যবসায় বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল।

www.pathagar.com

৮৯. উল্লিখিত তথ্যাবলী এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, নবী করীম (সা:) বা তাঁর সাহাবায়ে কেরামের (রা.) নিকট সুদ নিষিদ্ধ হবার সমসাময়িক কালে বাণিজ্যিক ঋণের ধারণা মোটেই অজানা ছিল না। সুতরাং এ কথা বলা সঠিক নয় যে, সুদের নিষেধাজ্ঞা কেবল ভোগ্য ঋণ পর্যন্ত সীমিত এবং বাণিজ্যিক ঋণের ওপর তা প্রযোজ্য নয়।

উচ্চ সুদের হারের যুক্তি

৯০. কতিপয় আপীলকারীর পক্ষ থেকে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিপক্ষে আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, সুদের নিষেধাজ্ঞা কেবল সেই সুদের ওপর প্রযোজ্য যেখানে সুদের হার মাত্রাতিরিক্ত এবং অতি উচ্চ। এ যুক্তির সমর্থনে তারা সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াত তুলে ধরেছেন:

ও হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা সুদ খেয়ো না যা দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত।

৯১. যুক্তিতে বলা হয়েছে, কুরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াতেই সর্ব প্রথম সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু আয়াতে ব্যবহৃত 'দ্বিগুণ' 'চতুর্গুণ' শব্দ দ্বারা এ নিষেধাজ্ঞাকে শর্তসাপেক্ষ ও সীমিত করে দেওয়া হয়েছে; এর অর্থ হচ্ছে, সুদের এই নিষেধাজ্ঞা কেবল সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে সুদের হার এত উচ্চ যে, তার ফলে আসল ঋণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর স্বাভাবিক যুক্তিসংগত কথা এই দাঁড়ায় যে, যেখানে সুদের হার এতটা বেশী ও উচ্চ নয় সে ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে সুদ ধার্য করা হয় সে সুদের হার এত অধিক ও উচ্চ নয় এবং তা আসলকে দ্বিগুণে পরিণত করে না। সুতরাং ব্যাংকের সুদের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

৯২. উপরের যুক্তিতে আল-কুরআন অধ্যয়নের একটা মৌলিক নিয়মকে উপেক্ষা করা হয়েছে। নিয়ম হচ্ছে, আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একই বিষয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন আয়াত থাকে তাহলে সে সব আয়াত একত্রে পাশাপাশি রেখে সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করতে হয়। এর কোন একটি আয়াতকে অন্যান্য আয়াত থেকে আলাদা করে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ রায়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, আল-কুরআনের চারটি সুরাতে সুদের কথা আছে। এটা স্বাভাবিক যে, আল-কুরআনের কোন আয়াত একই বিষয়ে অন্য আর এক আয়াতের পরিপন্থি হতে পারে না। আল-কুরআনে 'রিবা' সংক্রান্ত আয়াতের মধ্যে সূরা আল-বাকারাতে উল্লিখিত আয়াতগুলোতে 'রিবা' সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রায়ের ১৫ প্যারায় সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ এবং তার অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতগুলোর মধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

ওহে যারা ঈমান এনেছ, সুদ বাবদ যা পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক (২:২৭৮)।

www.pathagar.com

৯৩. উক্ত আয়াতে 'সুদ বাবদ যা পাওনা আছে' কথা দ্বারা ঋণের আসলের ওপর যে কোন অতিরিক্ত, তার পরিমাণ যাই হোক না কেন, তা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত আয়াতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে:

এবং যদি তোমরা তওবা কর বা মেনে নাও (সুদ বর্জন করার আদেশ) তাহলে তোমাদের আসল তোমাদের।

৯৪. এরপর এ বিষয়ে আর কোন দ্ব্যর্থবোধকতা বা অস্পষ্টতা থাকতে পারে না। বস্তুত সুদ বর্জন এবং এ থেকে তওবা করার আদেশ পালন করা সম্ভবই নয়, যদি আসলের ওপর যাবতীয় পাওনা ছেড়ে দেওয়া না হয়; আর ঋণদাতা কেবল তার আসল অংশ যা সে প্রথম ঋণ হিসেবে ঋণগ্রহীতাকে দিয়েছিল তাই ফেরত পাবে, তার বেশী নয়। সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা আল-বাকারার আয়াত একত্রে মিলিয়ে পড়লে এতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, *দ্বিগুণ-চতুর্গুণ* শব্দ আসলে নিয়ন্ত্রণ সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; আর তা সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কোন শর্তও নয়; বরং তৎকালে ব্যাপকভাবে প্রচলিত সুদী কারবারের জঘন্যতা বুঝানোর উদ্দেশ্যেই এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

৯৫. বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ রূপে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের কালাম-ই-পাক ব্যাখ্যা করার মৌলিক নীতিমালার একটি বিষয় ভাল করে বুঝতে হবে। পবিত্র কুরআন মূলত আইনের মৌলিক ধারা সম্বলিত কোন আইন গ্রন্থ নয়। আল-কুরআন বস্তুত একটি হেদায়েত গ্রন্থ; এর মধ্যে কিছু আইন ও বিধি-বিধান আছে; আদেশ-নিষেধ আছে; আছে উপদেশ-পরামর্শ; আর আছে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ও অনুপ্রেরণা-দায়ী অসংখ্য অভিব্যক্তি। আইন পুস্তকে থাকে না এমন অনেক শব্দ ও অভিব্যক্তি আল-কুরআনে আছে। কোন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানো বা কোন বিশেষ কাজের মন্দ পরিণতি ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যেই এসব শব্দ ও অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোকে কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞার নিয়ন্ত্রক বা শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের নিম্নোল্লেখিত আয়াত হচ্ছে স্বতঃপ্রমাণিত একটি উদাহরণ:

আমার আয়াতসমূহকে নগণ্য দামে বিক্রি করো না (২:৪১)।

৯৬. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ একথা বুঝেননি যে, আল-কুরআনের আয়াত বিক্রি করা অবৈধ কেবল এজন্য যে, এর জন্য প্রার্থিত দাম হচ্ছে অতি স্বল্প বা নগণ্য; অন্যথায় দাম বেশী বা উচ্চতর হলে এরূপ কাজ করার অনুমতি আছে। সাধারণ বুদ্ধির যে কোন লোক সহজেই উপলব্ধি করতে পারে যে, উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'স্বল্প বা নগণ্য দাম' শব্দগুলো নিয়ন্ত্রক প্রকৃতির শব্দ নয়; বরং এর দ্বারা এমন লোকদের অসৎ কর্মের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা আল-কুরআনের আয়াত বিক্রির মত গুরুতর পাপে লিপ্ত, যদিও এবাবদ তাদের আর্থিক লাভ বিরাট কিছু নয়। এখানে কিছুতেই

www.pathagar.com

এটা বুঝার অবকাশ নেই যে, এর দ্বারা তাদের প্রাপ্ত সে নগণ্য মূল্যকে দোষণীয় বলা হয়েছে; বরং এর দ্বারা আয়াত বিক্রির কাজকে নিন্দা করা হয়েছে।

৯৭. অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের অন্য আর এক জায়গায় বলা হয়েছে:
আর তোমাদের দাসীদের বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না যদি তারা সতী-থাকতে চায় (সূরা আন-নূর: ২৪:৩৩)।

৯৮. অবশ্যই এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, দাসী যদি সতী থাকতে না চায় তাহলে তাকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করানো যাবে; বরং এ আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে যে, বেশ্যাবৃত্তি নিজেই একটি জঘন্য পাপ কাজ তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু দাসীকে যদি তার নিজে পবিত্র থাকার ইচ্ছা সত্ত্বেও এ জঘন্য বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তাহলে তা হবে অধিক গুরুতর অপরাধ। এখানে 'যদি তারা সতী ও চরিত্রবতী থাকতে চায়' বাক্যাংশটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রকৃতির নয় এবং এ নিষেধাজ্ঞার শর্ত এটা নয় যে, দাসীর পবিত্র থাকার ইচ্ছা থাকলে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। বরং এ বাক্যাংশ সংযোজন করে এ অপরাধের জঘন্যতা ও ভীষণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একইভাবে সূরা আলে ইমরানের সুদ সংক্রান্ত আয়াতে 'দ্বিগুণ-চতুর্গুণ' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। সুদের নিষেধাজ্ঞাকে বিশেষায়িত করা এর উদ্দেশ্য নয়, অর্থাৎ দ্বিগুণ-চতুর্গুণ হলে এ আইন প্রযোজ্য হবে ব্যাপার এমন নয়। মাত্রাতিরিক্ত বা উচ্চতর হারে সুদ ধার্য করার অপরাধের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। উপরে উল্লিখিত সূরাতুল বাকারার আয়াতের আলোকে চিন্তা করলে সূরা আলে ইমরানের সুদ সংক্রান্ত আয়াতের এ উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

৯৯. দ্বিতীয়ত, নবী করীম (সা.) এবং তাঁর মহান সাহাবায়ে কেরামের (রা.) কাছেই আল-কুরআন নাযিল হয়েছে; তাঁরা বিভিন্ন আয়াত নাযিলের পটভূমি সম্পর্কে যেমন সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন তেমনি সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কেও ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সেজন্য আল-কুরআনের ব্যাখ্যা করতে হলে নবীর (সা.) হাদীসে বর্ণিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই তা করতে হবে অথবা হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরাম যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ভিত্তিতে করতে হবে। আল-কুরআন ব্যাখ্যার এই মূলনীতি সামনে রেখে অগ্রসর হলে নিশ্চয়তার সাথেই বলা যায় যে, 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞা সুদের কোন বিশেষ হার পর্যন্ত সীমিত ছিল না; বরং এর দ্বারা ঋণের আসলের উপর ধার্যকৃত যে কোন অতিরিক্তকে, তা যত কমই হোক না কেন, নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা প্রমাণের জন্য নিম্নে উল্লেখিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে সুদের ওপর এক সাধারণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই নিষেধাজ্ঞায় নবী (সা.) যে শব্দ

www.pathagar.com

ব্যবহার করেন ইবনে আবি হাতিমের বর্ণিত হাদীসে তা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা হলো:

২. শোন, জাহেলী যুগের সুদের যা কিছু পাওনা আছে, এখন থেকে তোমাদের জন্য তা সম্পূর্ণ রদ বা বাতিল করা হলো। তোমরা কেবল তোমাদের আসলের অধিকারী হবে যাতে তোমরা যুলুম না কর এবং তোমাদের ওপরও যুলুম করা না হয়। আর আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পাওনা সুদই হচ্ছে প্রথম সুদ যা সম্পূর্ণ রূপে বাতিল/মওকুফ ঘোষণা করা হলো।[৬০]

এখানে নবী করীম (সা.) আসলের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্তের সম্পূর্ণ অংশকেই বাতিল ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর কথায় কোন অস্পষ্টতা রাখেননি; বরং দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঋণদাতা কেবল তার আসল ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে এবং আসলের ওপর অতিরিক্ত এক পয়সা ধার্য করারও কোন সুযোগ তার নেই।

৩. হযরত হাম্মাদ বিন সালামাহ (রা.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে তাঁর জামে-তে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) বলেছেন,

ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ঋণের জামানত হিসেবে একটি ছাগল বন্ধক রাখে, তাহলে সে ছাগলের সেই পরিমাণ দুধ ব্যবহার করতে পারবে যে পরিমাণ খাবার সে ছাগলকে দেবে। আর যদি ছাগলকে প্রদত্ত খাদ্যের দামের চেয়ে দুধের দাম বেশী হয়, তাহলে দুধের অতিরিক্ত অংশ রিবা হবে।[৬১]

৪. ইমাম মালেক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা.) নিম্ন রায়টি উল্লেখ করেছেন,

কেউ যদি কোন ঋণ দেয়, তাহলে ফেরতযোগ্য আসল ব্যতীত অন্য কিছু ধার্য করা তার উচিত নয়।[৬২]

৫. ইমাম মালিক আরও বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলতেন:

কেও যদি ঋণ দেয়, তাহলে সে যা দিয়েছে তার চেয়ে ভাল কিছু ফেরতের চুক্তি করা তার জন্য উচিত নয়। এমনকি, যদি একমুঠো পশু-খাদ্যও হয়, তাহলে তাও হবে 'রিবা'।[৬৩]

৬. ইমাম বায়হাকি বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদকে (রা.) বলল,
আমি এক জনের কাছ থেকে এই শর্তে ৫০০ দিরহাম ধার নিয়েছি যে, আমি আমার ঘোড়াটি আরোহণ করার জন্য তাকে ধার দেব।

উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা.) বললেন, তোমার ঋণদাতা তোমার ঘোড়ায় আরোহণের যতটুকু সুবিধা গ্রহণ করবে ততটুকুই হবে রিবা।[৬৪]

www.pathagar.com

৭. উক্ত গ্রন্থকার আরও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালিককে (রা.) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে অন্য কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিয়েছে; অতঃপর ঋণগ্রহীতা তাকে উপহারস্বরূপ কিছু দান করল। তার জন্য এ উপহার গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না? হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) উত্তরে রাসূলুল্লাহর (সা.) একটি হাদীস পেশ করলেন। হাদীসটি হচ্ছে:

তোমাদের কেউ যদি কাউকে ঋণ দেয়, অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ দাতাকে খাবার সাধে, তাহলে তা গ্রহণ করা ঋণদাতার উচিত নয়; অথবা ঋণগ্রহীতা যদি তাকে তার বাহনে উঠার জন্য প্রস্তাব করে তাহলে তা গ্রহণ করা ঋণদাতার উচিত নয়, যদি না তাদের মধ্যে পূর্ব থেকে অনুরূপ উপহার লেন-দেন চালু থাকে।[৬৫]

হাদীসের মূল কথা হচ্ছে ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মধ্যে যদি বন্ধুত্ব থাকে এবং তারা যদি পরস্পর উপহার বিনিময়ে অভ্যস্ত হয়, তাহলে ঋণ দেওয়ার পরেও ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কর্তৃক প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করতে পারবে; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি পূর্বে কখনও ঋণদাতাকে কোন উপহার দিয়ে না থাকে, আর ঋণগ্রহণ করার পরই কেবল কোন উপহার দেয় তাহলে ঋণ দাতার জন্য তা গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ এরূপ উপহার থেকে 'রিবা'র গন্ধ আসে।

৮. আল-বায়হাকি আরও বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে অন্য এক ব্যক্তির নিকট ২০ দিরহাম ঋণী ছিল। অতঃপর সে ঋণদাতাকে উপহার দেওয়া শুরু করল। ঋণদাতা যখনই ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোন উপহার গ্রহণ করত, তখনই সে তা বাজারে বিক্রি করে দিত। এভাবে উপহার বিক্রি করে সে মোট ১৩ দিরহাম পেল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাকে আরও ৭ দিরহামের অতিরিক্ত গ্রহণ না করার জন্য পরামর্শ দিলেন। [৬৬]

৯. হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

লাভ (অতিরিক্ত) বহনকারী প্রত্যেক ঋণই রিবা।

হারিস ইবনে আবি উসামাহ তাঁর মুসনাদে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৬৭]

১০০. পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞ কাউন্সেল জনাব রিয়াযুল হাসান জিলানী উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে যে, হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এই হাদীসকে একটি দুর্বল হাদীস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আল্লামা মুনাভির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তিনি (মুনাভি) এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৮]

www.pathagar.com

১০১. একথা সত্য যে, হাদীসের কতিপয় সমালোচক এ হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেননি। কারণ এ হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন হচ্ছেন সওয়ার বিন মুসাব; আর তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয়নি। কিন্তু একই সাথে একথাও সত্য যে, অন্য কতিপয় হাদীসবেত্তা একে সহীহ্ হাদীস বলে গ্রহণ করেছেন, কারণ সওয়ারের দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্যান্য সূত্র থেকে এ হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার পক্ষে জোর সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লামা আযিযী,[৬৯] ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম আল-হারামাই[৭০] এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যাই হোক, এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহর (সা.) বাণী কি না এই সম্পর্কে উল্লেখিত মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু হযরত ফাযালাহ্ বিন উবাইদের মত কতিপয় সাহাবা এই একই নীতির কথা বর্ণনা করেছেন যার সম্পর্কে হাদীস বেত্তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। আল-বায়হাকি ফাযালাহ বিন উবায়েদের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

যে ঋণ কোন সুবিধা বা লাভ (benefit) নিয়ে আসে তা এক ধরনের 'রিবা'।[৭১]

১০২. ইমাম বায়হাকির মতে আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এই একই নীতির কথা বর্ণনা করেছেন।[৭২]

১০৩ উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কেউ দ্বিমত করেননি। হযরত আলীর (রা.) বর্ণনা রাসূল (সা.) থেকে আসার ব্যাপারটি যদি সংশয়মুক্ত নাও হয়, তবু অন্যান্য সাহাবাদের (রা.) বর্ণনা দ্বারা একই নীতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু শরীয়তের কোন নীতি বা বিধান বর্ণনা কালে সাহাবায়ে কেরাম গভীর মনোযোগ ও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তা করতেন এবং নিজস্ব ব্যক্তিগত চিন্তা বা মতামতের ভিত্তিতে এরূপ কোন নীতি বর্ণনা করা থেকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকতেন, সেহেতু একথা ধরে নেওয়া যায় যে, সাহাবাগণ (রা.) সর্বসম্মতভাবে কোন নীতি বর্ণনা করলে তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা.) কোন বক্তব্যের ভিত্তিতেই করেছেন। এ অনুমানের কথা যদি বাদও দেওয়া হয় তাহলেও উপরে উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহ একথা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট যে, সাহাবাগণ 'রিবা' বলতে ঋণের আসলের ওপর আরোপিত বা ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশকে বুঝতেন, তা যত কমই হোক না কেন। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ গ্রহীতা। আল-কুরআনের কোন আয়াতের মূল বক্তব্য এবং এর আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ ও পটভূমি সম্পর্কে তারা ছিলেন পূর্ণ জ্ঞাত। সুতরাং 'রিবা'র মত আল-কুরআনের পরিভাষা সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ভিত্তি।

১০৪. সরকার পক্ষের বিজ্ঞ কাউন্সেল জনাব রিয়াযুল হাসান জিলানী সম্মানিত সাহাবাদের (রা.) উল্লিখিত বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আর একটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁর মতে, এ বক্তব্যের নিজস্ব অন্তর্নিহিত একটি দুর্বলতা রয়েছে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, ঋণের মূল চুক্তিতে যদি আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করার কোন শর্ত না থাকে এবং ঋণদাতার পক্ষ থেকে যদি কোন অতিরিক্ত দাবী করা না হয়, আর এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতা আসল ঋণ পরিশোধকালে, যদি স্বেচ্ছায় আসলের অতিরিক্ত কিছু ঋণদাতাকে প্রদান করে, তাহলে এ অতিরিক্ত কখনও 'রিবা' হয় না। কিন্তু ওপরে উল্লেখিত বক্তব্যে ঋণগ্রহীতা এরূপ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অতিরিক্তকেও 'রিবা'র অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও ঋণদাতা নিজ উদ্যোগ ব্যতিরেকেই এ সুবিধা গ্রহণ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, উক্ত বক্তব্যকে 'রিবা'র পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না; আর এ রকম ঢিলেঢালা বক্তব্যকে নবীর (সা.) সাথে সংশ্লিষ্ট করা উচিত নয়, এমনকি সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যও এরূপ হতে পারে না।

১০৫. বিজ্ঞ কাউন্সেলর উক্ত যুক্তিতে তদানীন্তন আরবদের কথা বলার বিশেষ ধরনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তদানীন্তন আরবরা তাদের কথাবার্তায় সাধারণত আইনের জটিল ভাষা ব্যবহার করার পরিবর্তে সহজ-সরল ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। কখনও কখনও তারা কোন জটিল ও বড় বিষয়কেও অতি সংক্ষেপে স্বল্পতম শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করত। আলোচ্য বক্তব্যে সাহাবাগণ (রা.) 'জার্‌রা' ক্রিয়া পদ দ্বারা 'কর্জকে' বিশেষায়িত করেছেন। জার্‌রা-র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'টেনে আনা' (to pull)'; আর বাক্যটির আক্ষরিক (verbal) বঙ্গানুবাদ হচ্ছে 'প্রত্যেক ঋণ যা এর সাথে কোন লাভ (Benefit) টেনে আনে, তাই 'রিবা'। এখানে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'রিবা' কেবল সেই ঋণের ক্ষেত্রে উদ্ভব হয় যেখানে ঋণের মূল চুক্তির শর্ত অনুসারে ঋণ এর সাথে অতিরিক্ত/লাভ নিয়ে আসে। সুতরাং ঋণ পরিশোধকালে ঋণগ্রহীতা পূর্ব নির্ধারিত শর্ত ছাড়া স্বেচ্ছায় ঋণদাতাকে অতিরিক্ত কিছু দিলে তা সুদ নয়; উক্ত বক্তব্যেও একে সুদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

১০৬. উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, সুদের নিষেধাজ্ঞা কেবল উচ্চ সুদের হারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এ যুক্তিতে কোন সারবত্তা নেই। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহর নির্দেশ অতি স্পষ্ট যে, ঋণের শর্ত হিসেবে আসলের উপর পূর্ব নির্ধারিত যে কোন অতিরিক্ত, তা যত কমই হোক, হচ্ছে 'রিবা'। আর তাই নিষিদ্ধ।

রিবা ফদল ও ব্যাংক ঋণ

১০৭. আরও অগ্রসর হবার পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে এখানে সরকার পক্ষের বিজ্ঞ কাউন্সেল জনাব রিয়াযুল হাসান জিলানীর উত্থাপিত আর একটি যুক্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা জরুরী। জনাব জিলানী তাঁর যুক্তিতে বলেছেন যে, ঋণ প্রদানকালে প্রাথমিকভাবে ঋণের মূল চুক্তিতে আসলের ওপর যে অতিরিক্ত ধার্য করা হয় সে বৃদ্ধি 'রিবা আল-কুরআনের'

www.pathagar.com

সংজ্ঞায় পড়ে না; বরং তা হচ্ছে 'রিবা আল-ফদলের' অন্তর্ভুক্ত। তবে ঋণ গ্রহীতা যদি সঙ্গত কারণে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় এবং তার ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার বিনিময়ে আসল ঋণের উপর অতিরিক্ত ধার্য করা হয়, তাহলে সেই অতিরিক্ত হবে 'রিবা আল-কুরআন'। সুতরাং বিজ্ঞ কাউন্সেলের মতে, আধুনিক ব্যাংকিং লেনদেনে যেহেতু ঋণ প্রদানকালেই অতিরিক্ত ধার্য করা হয়; সেহেতু এই অতিরিক্ত আল-কুরআনের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না; বরং এক্ষেত্রে 'রিবা ফদলের' বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। তিনি আরও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, 'রিবা আল-ফদলের' নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা মুসলমানদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। রাসুলুল্লাহ (সা.) 'রিবা ফদলের' এ নিষেধাজ্ঞাকে কখনও সংবিধি, হুকুম বা আইন হিসেবে জারি করেননি অথবা খুলাফায়ে রাশেদীন বা মুসলিম শাসকবৃন্দ তা করেছেন বলে ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় না। বিজ্ঞ কাউন্সেল জোড়ালোভাবে দাবী করেছেন যে, 'রিবা ফদলের' এ নিষেধাজ্ঞা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের ওপর প্রযোজ্য নয়। এই নিষেধাজ্ঞা পাকিস্তানের সংবিধানের ২০৩বি ধারায় বর্ণিত 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' (Muslim Personal Law) এর অন্তর্ভুক্ত এবং সেই বিধি-বিধান দ্বারাই পরিচালিত। সুতরাং তা ফেডারেল শরীয়াহ কোর্ট এবং পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ আপীলেট বেঞ্চের এখতিয়ার বহির্ভূত।

১০৮. 'ঋণের প্রাথমিক বা মূল চুক্তিতে ধার্যকৃত অতিরিক্ত হচ্ছে রিবা আল-ফদল, রিবা আল-কুরআন নয়'- বিজ্ঞ কাউন্সেলের এ যুক্তি নজিরবিহীন এক তত্ত্বের ওপর ভিত্তিশীল। যুক্তির প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, কেবল সেসব ক্ষেত্রেই 'রিবা আল-কুরআনের' উদ্ভব ঘটে যেখানে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর ঋণদাতা তার পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি করার বিনিময়ে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। এ সম্পর্কে এই রায়ের ৪৩ হতে ৫৪ প্যারায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে যে, 'রিবা আল-কুরআন' কেবল উপরোক্ত ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রথম ঋণ দানকালে প্রাথমিক চুক্তিতে অতিরিক্ত ধার্য করা হোক বা প্রথম মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধি করার সময়ে তা করা হোক সকল ক্ষেত্রেই এ বৃদ্ধি হচ্ছে 'রিবা আল-কুরআন'। এখানে আমরা উল্লেখিত যুক্তির দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ অংশে বলা হয়েছে যে, ঋণের প্রাথমিক চুক্তিতে আসলের উপর কোন অতিরিক্ত ধার্য করা হলে তা হবে 'রিবা আল-ফদল'। এখানে 'রিবা আল-ফদলের' ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিজ্ঞ কাউন্সেল এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন যে, সুদমুক্ত ঋণও 'রিবা আল-ফদলের' নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত বলে তিনি দাবী করেছেন। যে হাদীস দ্বারা 'রিবা

www.pathagar.com

আল-ফদল' নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে হাদীস উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন যে, হাদীসে পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তের সাথে উপস্থিত ক্ষেত্রে হাতে হাতে নগদ (spot- transaction) বিনিময়ের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সোনার পরিবর্তে সোনা বিনিময়কালে যদি সমান সমান পরিমাণ বিনিময় করা হয় এবং যদি কোন অতিরিক্ত লেনদেন করা না হয়, কিন্তু যদি একপক্ষ তার সোনা তাৎক্ষণিক নগদ প্রদান করে আর অপরপক্ষ তার সোনা প্রদান বিলম্বিত করে, তাহলে তা 'রিবা আল-ফদলের' নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। সুতরাং বিজ্ঞ কাউন্সেল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, কোন ঋণ লেনদেন ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ যদি আসল অর্থ (স্বর্ণ বা রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত) পরিশোধ বিলম্বিত করে তাহলে উক্ত লেনদেন 'রিবা ফদলে' পর্যবসিত হয় যদিও আসলের সাথে অতিরিক্ত কিছু ফেরত দেওয়া না হয়। সুতরাং এরূপ লেনদেন হচ্ছে মাকরূহ; কারণ সোনার বদলে সোনার (অথবা অর্থের বদলে অর্থ) বিনিময় কেবল দুটি শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন যোগ্য। শর্ত দুটি হচ্ছে:

ক. উভয় পণ্যের প্রদত্ত পরিমাণ সমান সমান হওয়া এবং

খ. লেনদেন হাতে হাতে তাৎক্ষণিক নগদ হওয়া।

১০৯. সুদমুক্ত ঋণের বেলায় দ্বিতীয় শর্তটি অনুপস্থিত; আর সুদ ভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে দুটি শর্তই অনুপস্থিত; কিন্তু বিজ্ঞ কাউন্সেলের মতে, এই দুই ধরনের ঋণই 'রিবা ফদলের' অন্তর্ভুক্ত।

১১০. বিজ্ঞ কাউন্সেলের উক্ত যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এ যুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণের লেনদেনকে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে। এতে ঋণ এবং ক্রয়-বিক্রয়কে এক করে দেখা হয়েছে। 'রিবা ফদল' সংক্রান্ত হাদীসটি আসলে ক্রয়-বিক্রয় তথা বিনিময়জনিত লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত, ঋণ লেনদেনের সাথে নয়। হাদীসে ব্যবহৃত যথার্থ শব্দগুলো হচ্ছে:

পরিমাণ সমান সমান ব্যতিরেকে সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করো না.... এবং বিলম্বে (সোনা বা রূপা) গ্রহণের শর্তে নগদে (সোনা বা রূপা) বিক্রি করো না।[৭৩]

১১১. হাদীসের 'বিক্রি করো না' শব্দগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে ক্রয়-বিক্রয় লেনদেনের কথা বলা হয়েছে, ঋণের কথা নয়। বস্তুত ক্রয়-বিক্রয় এবং ঋণের মধ্যে অনেক দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে যে, কোন জিনিস বাকীতে বিক্রয় করা হলে, বিক্রেতা বকেয়া দাম পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ক্রেতাকে দাম পরিশোধ করতে বলতে পারে না; কিন্তু সুদমুক্ত ঋণের বেলায় ঋণদাতা, চুক্তিতে সময় নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও যে কোন সময়ে ঋণ ফেরত চাইতে পারে। এক্ষেত্রে চুক্তিতে সময় নির্ধারণ করার নৈতিক মূল্য অবশ্যই আছে; কিন্তু আইনগত

www.pathagar.com

বাধ্যবাধকতা এতে নেই।[৭৪] এ কারণে সুদমুক্ত ঋণ লেনদেন বৈধ; কিন্তু সোনার পরিবর্তে সোনা বাকীতে বিনিময় করা অবৈধ। সুতরাং সুদবিহীন ঋণ 'রিবা ফদলের' অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞ কাউন্সেলের এ যুক্তিটি ভ্রান্ত ও প্রত্যাখানযোগ্য। নবী করীম (সা.) সুদমুক্ত ঋণ অনুমোদন করেছেন শুধু তাই নয়, তিনি নিজে এরূপ ঋণ লেনদেনও করেছেন। কিন্তু তিনি সোনার বদলে সোনা বাকীতে বিক্রয়কে কখনও অনুমোদন করেননি। বিজ্ঞ কাউন্সেল কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া ঋণ গ্রহণ করাকে নিরুৎসাহিত ও নিন্দা করেছেন এবং ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মৃত্যুবরণকারী এক ব্যক্তির নামাজে জানাযা পড়া থেকে বিরত থেকেছেন। আবারও বলতে হয় যে, বিজ্ঞ কাউন্সেল এখানেও ভিন্ন ভিন্ন দুটি বিষয়কে এক করে ফেলেছেন। মহানবী (সা.) ঋণ গ্রহণের নিন্দা এজন্য করেননি যে, ঋণ গ্রহণ নিজেই একটি নিষিদ্ধ কাজ; বরং তিনি ঋণ গ্রহণ করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন শুধু এ কারণে যে, প্রকৃত ও যথার্থ প্রয়োজন ছাড়া কারো পক্ষেই ঋণের বোঝা মাথায় তুলে নেয়া উচিত নয়। ঋণ লেনদেন যদি নিষিদ্ধ হতো এবং এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ঋণ গ্রহণের নিন্দা করতেন, তাহলে ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা উভয়ের ওপরই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হতো। কিন্তু ঋণ প্রদান করা নিষিদ্ধ এমন কথা কখনও বলা হয়নি। বিজ্ঞ কাউন্সেল স্বয়ং ইবনে মাজা থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, দান (সাদাকাহ্) করা অপেক্ষা ঋণ প্রদান করা অধিকতর পূণ্যের কাজ।[৭৫] এটা স্পষ্ট যে, ঋণ নিজেই একটি নিষিদ্ধ লেনদেন নয়; তবে মানুষ যাতে প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া ঋণের জালে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সতর্ক করা হয়েছে। অপরপক্ষে সোনার পরিবর্তে সোনা বা রূপার বদলে রূপা বাকীতে বিক্রয় করা নিজেই একটি নিষিদ্ধ কাজ। এ নিষেধাজ্ঞা দাতা-গ্রহীতা উভয় পক্ষের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য; এদের কাউকে কোন অবস্থায়ই অনুরূপ লেনদেন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

১১২. সংক্ষেপে মূল কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে, 'রিবা আল-ফদলের' উক্ত হাদীসে কেবল ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় সংক্রান্ত লেনদেনকে বুঝানো হয়েছে এবং ঋণ লেনদেনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ঋণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত 'রিবার বিষয়' রিবা আল-কুরআন বা 'রিবা আল-জাহেলিয়াতের' বিধির অন্তর্ভুক্ত। এই বিধিতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, ঋণদাতা কেবল তার আসল ফেরত পাবে, আর ঋণদাতা যদি কেবল তার প্রদত্ত ঋণের আসল ফেরত নেয়, তাহলে সে ঋণকে কখনও নিষিদ্ধ বলা হয়নি। সুতরাং একথা বলা সঠিক নয় যে, সুদ ভিত্তিক ঋণ প্রদানকালে মূল চুক্তিতে প্রাথমিকভাবে যে অতিরিক্ত ধার্য করা হয় তা 'রিবা ফদলের' অন্তর্ভুক্ত এবং তা 'রিবা আল-কুরআন' নয়; আর ব্যাংকের সুদ যেহেতু 'রিবা আল-ফদলের' অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তা হারাম নয়।'

www.pathagar.com

সুদের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অত্র আদালতের এখতিয়ার

১১৩. উপরে প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে যে, ব্যাংকগুলো তাদের প্রদত্ত ঋণের ওপর যে সুদ ধার্য করে তা 'রিবা ফদল' নয় বরং তা হচ্ছে 'রিবা আল-কুরআনের' অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সুদের নিষেধাজ্ঞা অমুসলিম নাগরিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি না সে বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তবে বিজ্ঞ কাউন্সেল এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন সে সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, 'রিবা ফদলে'র নিষেধাজ্ঞা কেবল মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য এবং ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত বিধিবিধানসমূহ পাকিস্তানের সংবিধানের ২০৩ বি ধারায় বর্ণিত মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা 'ফেডারেল শরীয়া কোর্ট' বা 'শরীয়াহ আপীলেট বেঞ্চ অব সুপ্রীম কোর্টে'র এখতিয়ার বহির্ভূত বলে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, দুটি সুস্পষ্ট কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

১১৪. প্রথমত, এই মোকদ্দমায় বিচারাধীন আইনগুলো হচ্ছে বর্তমানে বিদ্যমান ও প্রচলিত আইন; এসব আইন এখন যেভাবে যেরূপে আছে সেভাবেই একে বিবেচনা করতে হবে; বিজ্ঞ কাউন্সেলের মতে আইনগুলো কিরূপ হওয়া উচিত ছিল তা এখানে বিচার্য নয়। আর বর্তমানে বিদ্যমান আইনসমূহ প্রয়োগ ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি; বরং দেশের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ওপরই তা সমভাবে প্রযোজ্য।

১১৫. দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের সংবিধানের ২০৩ বি ধারা অনুসারে সুদ সংক্রান্ত আইনগুলো কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের' আওতাভুক্ত বলে যে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে তার ভিত্তি সম্ভবত:মোছা: ফারিশতা (PLD 1981 SC 120) মামলায় এই আদালতেরই পূর্ববর্তী একটি রায়। কিন্তু মনে হয়, বিজ্ঞ কাউন্সেল এটা জানেন না যে, আদালত পরবর্তীতে ড. মাহমুদুর রহমান বনাম পাকিস্তান সরকার (PLD 1994 SC 607) মামলায় তাঁদের এ অভিমত পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন করেছেন। সেই সংশোধিত রায়ে বলা হয়েছে যে, এই বিধিবদ্ধ আইন যদিও সাধারণভাবে মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য, তবু তা পাকিস্তান সংবিধানের ২০৩ বি ধারায় বর্ণিত মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। সুতরাং ব্যাংকের সুদ সংক্রান্ত আইন অত্র আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত বলে বিজ্ঞ কাউন্সেল যে যুক্তি দিয়েছেন তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

সুদ নিষিদ্ধ করার মৌলিক কারণ

১১৬. পরবর্তী যুক্তি হচ্ছে যে, কয়েকজন আপীলকারী বলেছেন, সুদ নিষিদ্ধ করার মৌলিক কারণ (ইল্লত) হচ্ছে যুলুম বা অবিচার ও বেইনসাফী (Injustice)। পবিত্র কুরআন বলছে,

www.pathagar.com

এবং যদি তোমরা মেনে নাও (তওবা কর বা ফিরে আস) তাহলে তোমাদের আসল তোমাদের। তোমরা যুলুম করবে না, তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না (২:২৭৯)।

১১৭. এখানে, *তোমরা যুলুম করবে না, তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না-* কথা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 'রিবা' নিষিদ্ধ করার মূল কারণ হচ্ছে যুলুম। এ প্রেক্ষিতে কতিপয় আপীলকারী যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন যে, একজন ধনী লোক ব্যাংক থেকে অর্থ ধার নিয়ে সে অর্থ কাজে লাগিয়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করে; এই ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে সুদ আদায় করা হলে তাতে কোন যুলুম হতে পারে না। এভাবে সুদ হারাম হবার মূল কারণ অনুপস্থিত বিধায় এসব বাণিজ্যিক ঋণের উপর ব্যাংক যে সুদ ধার্য করে তাকে নিষিদ্ধ গণ্য করা যায় না। জনাব খালিদ এম. ইসহাক, এডভোকেট, যিনি স্বাস্থ্যগত অসুবিধা সত্ত্বেও অনুগ্রহ করে এ মামলার জুরিস কনসাল্ট হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন, প্রায় এই একই ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রদত্ত সকল ঋণই বৈধ এমন দাবী করার পরিবর্তে জনাব খালিদ ইসহাক প্রতিটি ঋণকে এর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সহ বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে কোন যুলুম আছে কি না তা পরীক্ষা করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এভাবে দেখার পর কোন ঋণে জুলুম সূচক কোন উপাদান পাওয়া গেলে তাকে সুদ এবং এই সুদকে নিষিদ্ধ গণ্য করতে হবে; কিন্তু যদি তেমন কিছু পাওয়া না যায়, তাহলে একে হারাম গণ্য করা যাবে না।

১১৮. আমরা যথার্থ গুরুত্বের সাথে যুক্তিটি বিবেচনা করেছি; কিন্তু এর সাথে একমত হতে পারিনি। দুটি অনুমিতির (Assumptions) ওপর ভিত্তি করে এ যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে; প্রথম ভিত্তি হচ্ছে যে, সুদ হারাম হবার মূল কারণ যুলুম; আর এর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে যে, আধুনিক সুদী লেনদেনে কোন যুলুম নেই বা একালে এমন কিছু সুদী লেনদেন আছে যেগুলোতে যুলুমের কোন উপাদান নেই। কিন্তু গভীর অধ্যয়নের পর প্রতীয়মান হয় যে, এ অনুমিতি দুটো আদৌ সঠিক নয়। উভয় অনুমিতিকে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

ইল্লত ও হিকমতের পার্থক্য

১১৯. প্রথম অনুমিতিতে ধরে নেয়া হয়েছে যে, সুদ নিষিদ্ধ হবার মৌলিক কারণ (ইল্লত) হচ্ছে যুলুম। প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন নিষেধাজ্ঞার ইল্লত ও হিকমতের মধ্যে পার্থক্য না বুঝা এবং উভয়ের মধ্যে গোল পাকিয়ে ফেলার কারণে এরূপ অনুমিতি সম্ভব হয়েছে। ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি হচ্ছে যে, এতে কোন আইনের ক্ষেত্রে ইল্লত ও হিকমতের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। ইল্লত হচ্ছে

www.pathagar.com

কোন লেনদেনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য যার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগ করা সম্ভব নয়; আর হিকমত হচ্ছে বিচক্ষণতা (Wisdom) ও দর্শন (Philosophy) যা সামনে রেখে আইন প্রণেতা কোন আইন প্রণয়ন করে, অথবা কল্যাণ (benefit) যা আইন প্রয়োগের দ্বারা লাভ করা যাবে বলে মনে করা হয়। নীতি হচ্ছে যে, আইনের প্রয়োগ হয় ইল্লতের ভিত্তিতে, হিকমতের ভিত্তিতে নয়। অন্য কথায়, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যদি এর ইল্লত (লেনদেনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য) উপস্থিত থাকে তাহলে হিকমত (the wisdom) পরিদৃষ্ট না হলেও সংশ্লিষ্ট আইন প্রযোজ্য হবে। ধর্মনিরপেক্ষ আইনের ক্ষেত্রেও এ নীতি স্বীকৃত। একটি সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে আশা করা যায়। রাস্তায় গাড়ি চলাকালে সামনে রাস্তার লালবাতি জ্বলে উঠলে গাড়ি থামাতে হবে। গাড়ি চালকের জন্য এটি একটি অবশ্য পালনীয় বিধান। এ আইনের ইল্লত হচ্ছে লালবাতি; কিন্তু এর হিকমত হচ্ছে দুর্ঘটনা এড়ানো। এক্ষেত্রে যখনই লালবাতি জ্বলবে তখনই এ আইন প্রযোজ্য হবে; দুর্ঘটনার আশংকা আছে কি না তার উপর এ আইনের প্রয়োগ নির্ভর করবে না। অর্থাৎ যদি লালবাতি জ্বলে ওঠে তাহলে সকল গাড়ীই থামতে বাধ্য হবে। রাস্তার উভয় দিকে যদি আর কোন যানবাহন নাও থাকে তবুও এ আইন মানতে হবে। এক্ষেত্রে আইনটির মৌলিক হিকমত পরিদৃষ্ট নয়, কারণ এখানে কোন দিক থেকেই দুর্ঘটনার কোন আশংকা নেই। তবু আইনটি এর পূর্ণ শক্তিসহ প্রযোজ্য হবে, কেননা আইনের প্রকৃত ইল্লত লালবাতি জ্বলার শর্ত এখানে উপস্থিত। এ ব্যাপারে আল-কুরআন থেকে আর একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। আল-কুরআন মদ হারাম করেছে। এ নিষেধাজ্ঞার ইল্লত হচ্ছে প্রমত্ততা (Intoxication); আর এর হিকমত সম্পর্কে আল-কুরআনে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে:

শয়তান তো চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করবে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদের ফিরিয়ে রাখবে। সুতরাং তোমরা কি বিরত হবে না (৫:৯১)।

১২০. উক্ত আয়াতে শরাব ও জুয়া নিষিদ্ধ করার জন্য আল-কুরআন যে দর্শনের কথা বলেছে তা হচ্ছে যে, মদ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতার জন্ম দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে। কেউ কি এ দাবী করতে পারে যে, সে দীর্ঘকাল ধরে মদ পান করছে, কিন্তু কখনও কারও সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি হয়নি; এবং যেহেতু মদ নিষিদ্ধ হবার মূল কারণ এখানে অনুপস্থিত, সেহেতু তাকে মদ পান করার অনুমতি দেওয়া উচিত? অথবা কেউ যদি এ যুক্তি দেখায় যে, দীর্ঘকাল যাবৎ মদপানে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে কখনও ওয়াক্ত মোতাবিক নামাজ আদায় করা ছাড়েনি; সুতরাং এখানে মদ হারাম হবার মূল কারণ অনুপস্থিত বিধায়

www.pathagar.com

তার জন্য মদ পান হালাল হওয়া উচিত, তাহলে তার এ যুক্তি কি সঙ্গত হবে? নিশ্চয়ই নয়; এরূপ যুক্তি কেউ মেনে নিতে পারে না; কারণ আল-কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতার কথা বলা হয়েছে তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার ইল্লত হিসেবে বলা হয়নি বরং এখানে মদ ও জুয়ার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু মন্দ ফলাফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। এগুলো হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার হিকমত ও দর্শন। এগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ নির্ভর করে না। একই ভাবে আল-কুরআন সুদ নিষিদ্ধ করে নিষেধাজ্ঞার হিকমত বা দর্শন রূপে যুলুমের কথা উল্লেখ করেছে। এর মানে এই নয় যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যুলুম বা এর কোন উপাদান অনুপস্থিত পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য হবে না। সুদ নিষিদ্ধ করার ইল্লত (মৌলিক বৈশিষ্ট্য) হচ্ছে ঋণের আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা। যে লেনদেনে এই ইল্লত পাওয়া যাবে সেখানেই এ নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই প্রযোজ্য হবে; এতে এর দর্শন ও হিকমত পরিদৃষ্ট হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

১২১. এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। বিষয়টি হচ্ছে, কোন আইনের ইল্লতকে অবশ্যই বিধিবদ্ধ-ধরাবাঁধা সংজ্ঞা দ্বারা নিরূপণযোগ্য হতে হবে যাতে এ ব্যাপারে কোন প্রকার অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থবোধকতা না থাকে এবং এ বিতর্ক সৃষ্টি হতে না পারে যে, এখানে ইল্লত আছে, না নাই। কোন আপেক্ষিক শব্দকে, যা স্বভাবতই অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক, কোন আইনের ইল্লত হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়; কেননা এতে ইল্লতের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে, যা আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবে। জুলুম (অবিচার) একটি আপেক্ষিক তথা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ, যার যথার্থ কোন সংজ্ঞা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কোনটি জুলুম, আর কোনটি জুলুম নয়, এ ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে। বিশ্বে বিভিন্নমুখী, এমনকি, পরস্পর বিরোধী নানা ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যেকেই দাবী করছে যে, তারা জুলুমের অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে, এক ব্যবস্থায় যাকে বলা হয় জুলুম, অপর আর এক ব্যবস্থায় তাই বিবেচিত হচ্ছে ন্যায় সঙ্গত সুবিচার হিসেবে। সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবী করা হয় যে, ব্যক্তি মালিকানাই হচ্ছে সকল জুলুমের উৎস; অপরদিকে পুঁজিবাদ বলছে, ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তিই হচ্ছে একটি বড় জুলুম। এরূপ দ্ব্যর্থবোধক একটি শব্দ কোন আইনের ইল্লত হওয়ার যোগ্য হতে পারে না।

১২২. এ মামলার জুরিস কন্‌সাল্ট জনাব খালিদ এম. ইসহাক, এডভোকেট বিষয়টিকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে 'জুলুম' অথবা 'রিবা'র বাঁধাধরা সংজ্ঞা নেই- এজন্য একে আল্লাহর রহমত মনে করা উচিত; কেননা, এর দ্বারা এ বিষয়ে নমনীয়তা রাখা হয়েছে; ফলে প্রত্যেক যুগের মুসলিমগণ বিদ্যমান

www.pathagar.com

পরিস্থিতি-পরিবেশ সামনে রেখে নিজেরাই স্থির করতে পারে, কোনটি জুলুম, আর কোনটি জুলুম নয়। বিজ্ঞ কন্‌সাল্ট তাঁর লিখিত বক্তব্যে নিম্ন ভাষায় বিষয়টি পেশ করেছেন:

ক. সংজ্ঞা নিরূপণের লক্ষ্যে বিভ্রান্তিকর পথে পরিচালিত যাবতীয় প্রচেষ্টার অবসান বাঞ্ছনীয়। আল-কুরআনে 'রিবা'র সংজ্ঞা নেই, এটা এভাবেই মেনে নেয়া উচিত; বরং একে আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ মনে করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবেই বাঁধাধরা (Rigid) কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। এ অবস্থা মুসলমানদেরকে স্থান-কাল পরিস্থিতি অনুসারে যুলুম চিহ্নিত করায় তাদের নিজস্ব পথ নির্দেশ ও নীতিমালা উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করবে। অর্থনৈতিক অবস্থা কখনও স্থিতিশীল নয়, তেমনি হচ্ছে মানবিক পরিস্থিতিও।

খ. নির্ভুল অর্থনৈতিক পলিসিতে "অভীষ্ট সাধনার্থে সরকারের যাবতীয় কাজই সুসমন্বিত হতে হয় যার প্রকৃত ও বিঘোষিত লক্ষ্য (Objective) হচ্ছে সরকারের দায়িত্বে ন্যস্ত সমগ্র জনমণ্ডলীর, কোন বিচ্ছিন্ন অংশের নয়, অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা। ইসলামী অর্থনৈতিক ধারণা এ লক্ষ্যের পরিপন্থি নয় বা এতদুভয়ের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যও নেই। সুতরাং ইসলামী ধারাকে খাটো করে দেখা এবং একে মূল অর্থনৈতিক ধারা, কর্মসূচি থেকে আলাদা করা উচিত নয়। আসলে এ দুটো পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এদুটোকে একীভূত ও সমন্বিত করে সর্বাধিক কল্যাণ ও উত্তম ফল লাভের সম্ভাবনার ব্যাপারে আইনবেত্তাদের নিরাশ হওয়া চলবে না; মনের দুয়ার একেবারে রুদ্ধ করা উচিত নয়। কিন্তু এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মুসলিম আইনবেত্তাগণ সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের (যেমন অর্থনীতি) সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি চলছেন না অথবা এ বিষয়ে নিজেরা ওয়াকিফহালও থাকছেন না। অথচ তাদের মধ্যে পাইকারীভাবে এর বিরোধিতা করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তারা একে সন্দেহ করেন, ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক বলে মনে করেন এবং সোজা কথায় একে অনৈসলামী বলে আখ্যায়িত করেন এবং এর অধ্যয়ন পরিহার করে চলেন।

১২৩. আমরা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে এ বক্তব্য বিবেচনা করেছি। কিন্তু বিজ্ঞ জুরিস কনসাল্টের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে বলতে হয় যে, উল্লিখিত যুক্তিতে কতিপয় মৌলিক বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা হলো:

১২৪. প্রথমত, বিজ্ঞ জুরিস কন্‌সাল্ট ইচ্ছাকৃতভাবে সুদের (রিবা) কোন সুনির্ধারিত (Rigid) সংজ্ঞা না দেওয়াকে (আল কুরআনে) মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যুক্তি থেকে মনে হয় যে, এতে ধরে নেয়া হয়েছে, (presume) মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত সকল কাজের সুনির্ধারিত

www.pathagar.com

সংজ্ঞা প্রদান করেছে; কিন্তু কেবল 'রিবা'র ক্ষেত্রে আল-কুরআন ইচ্ছাকৃতভাবে রিবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান থেকে বিরত থেকেছে। এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, আল-কুরআন এর দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন কাজের আইনী সংজ্ঞা কদাচিৎই দিয়েছে। আল-কুরআন শরাব বা মদকে (খমর) নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু এর কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, জুয়ার (ক্বিমার) কোন সংজ্ঞাও এতে নেই, যিনা (adultery or fornictaion) চুরি, ডাকাতি, এমনকি, কুফরের সংজ্ঞাও কুরআন মজীদ দেয়নি। অনুরূপভাবে আল-কুরআন যেসব কাজ করার আদেশ করেছে যেমন সালাহ, সওম (Fasting), যাকাত, হজ্ব অথবা জিহাদ, সেগুলোকেও সংজ্ঞায়িত করেনি। এ থেকে কি আমরা এটা ধরে নেব যে, যেহেতু এসব বিষয় ও ধারণাগুলোর (concepts) কোনটারই কোন বিশেষ অর্থ নেই, সেহেতু এতদসংক্রান্ত যাবতীয় আইন-কানুন (Injunctions) স্থান-কাল পরিস্থিতির ভিত্তিতে সদা পরিবর্তনশীল মানবীয় খাম-খেয়ালী অনুসারে কার্যকর হবে? বস্তুত আল-কুরআন এসব বিষয় বা ধারণার (concepts) সংজ্ঞা এজন্য দেয়নি যে, এগুলোর অর্থ এতটা সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত ছিল যে, এর প্রকাশ্য কোন সংজ্ঞার প্রয়োজনই ছিল না। পরিভাষাসমূহের আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা থাকতে পারে এবং তা থেকে মতপার্থক্যের সৃষ্টিও হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এসব বিধি-বিধানগুলো শূন্যের ওপর বা হাওয়ায় ভেসে চলছে যার আদৌ কোন অর্থ নেই।

১২৫. দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞ জুরিস কন্‌সাল্ট তাঁর উল্লেখিত প্রতিলিপির (Extract) বাঁকা ছাদের অক্ষরে মুদ্রিত (Italicized) অংশে সুস্থ অর্থনৈতিক পলিসির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সার-নির্যাস তুলে ধরেছেন। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কারোই প্রশ্ন থাকার কথা নয়। প্রায় সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একই লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ লক্ষ্য অর্জিত হবে কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরই বিভিন্নমুখী পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। বিজ্ঞ জুরিসকন্‌সাল্ট পরামর্শ দিয়েছেন যে, *ইসলামী অর্থনৈতিক ধারাকে খাটো করে দেখা এবং একে মূল অর্থনৈতিক ধারা, কর্মসূচি থেকে পৃথক করা উচিত নয়।* বিষয়গত (substantially) ভাবে এ পরামর্শ যুক্তিপূর্ণ মনে হয়; কিন্তু রিবার সংজ্ঞা অমীমাংসিত রাখা এবং স্থান-কাল পরিস্থিতি অনুসারে যুলুম চিহ্নিত করার নীতিমালা উদ্ভাবনের সুযোগ থাকার প্রেক্ষাপটে এই পরামর্শের অর্থ হচ্ছে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে খাঁটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণই (pure economic approach) জুলুম চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকারী ভূমিকা পালন করবে এবং প্রকারান্তরে শরীয়তের হালাল-হারামের বিষয়ও এর দ্বারাই নিরূপিত হতে থাকবে। তাছাড়া একথা যদি মেনেও নেয়া হয়, তাহলেও প্রশ্ন জাগে যে, অর্থনীতির কোন ধারাকে গ্রহণ করা হবে? পরস্পর বিরোধী অসংখ্য তত্ত্ব আছে,

www.pathagar.com

প্রতিটি তত্ত্বই সমগ্র মানবমণ্ডলীর (whole population) অর্থনৈতিক কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনে প্রতিযোগিতা করার দাবী করছে। অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা যাঁরা করেন, তাঁরা সকলে কল্যাণ অর্থনীতির মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ সনাক্ত ও চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এ উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপ দানের পন্থা বা স্ট্রাটেজি কি হবে এ ব্যাপারেই সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক মতপার্থক্য। এ উদ্দেশ্য অর্জনে ইসলামী স্ট্রাটেজি সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে মানবতার সদা পরিবর্তনশীল অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যথোচিত সমাধান দিতে পূর্ণ সক্ষম। ইসলামী স্ট্রাটেজি আধুনিক চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধী যেমন নয়, তেমনি উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পথ বির্নিমাণে আধুনিক তত্ত্বের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলও নয়। যে কোন গঠনমূলক পরামর্শ, তা যেখান থেকেই আসুক, গ্রহণে ইসলামে কোন সমস্যা নেই; কিন্তু সেই সাথে একথাও ঠিক যে, ইসলামের নিজস্ব নীতিমালা আছে; এই নীতির ক্ষেত্রে আপস ইসলামে সম্ভব নয়, কারণ এর উৎস হচ্ছে ঐশী নির্দেশনা।

এই নীতিমালাই হচ্ছে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রেখা টেনে দিয়েছে। এই মূলনীতিসমূহের একটি হচ্ছে রিবার নিষেধাজ্ঞা। ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনৈতিক পলিসির হাতে এই নীতিকে ছেড়ে দেওয়া আর ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়া এক কথা।

১২৬. তৃতীয়ত, জুলুম বা বেইনসাফীর অবসানের লক্ষ্যে কেবল সুদই নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা নয়; বরং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রায় সকল ইসলামী বিধি-নিষেধেরই এটি একটি মৌলিক কারণ। কিন্তু এ ব্যাপারে আল-কুরআন ও সুন্নাহ কোন বিশেষ আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষেত্রে, মানুষের বিচারবুদ্ধি ও মূল্যায়নের (Rational assessment) ওপর নির্ভর যেমন করেনি, তেমনি এতে কোন জুলুম আছে কি নেই তা নিরূপণ করার দায়িত্বও মানবীয় যুক্তির ওপর ছেড়ে দেয়নি। আল-কুরআন এবং সুন্নাহর অভিপ্রায় যদি এই হতো যে, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মানবীয় বিচারবুদ্ধির ওপর ন্যস্ত করবে, তাহলে আদেশ-নিষেধের এত বিরাট ফিরিস্তিরা তালিকা নাযিল করার কোন দরকার হতো না; বরং সেক্ষেত্রে একটি মাত্র আদেশই যথেষ্ট হতো; কেবল একথা বললেই চলতো যে, সকল মানুষকে তাদের যাবতীয় লেনদেনে জুলুম পরিহার করতে হবে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ এ ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিবহাল যে, ব্যাপক সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত সত্যে পৌঁছার মত অসীম ক্ষমতা মানবীয় বিচার-বুদ্ধির নেই। বস্তুত মানবীয় বিচার-বুদ্ধির কতিপয় সীমাবদ্ধতা আছে, যার উর্ধ্বে উঠে এটা যথার্থভাবে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে অথবা বিভ্রান্তির কারে পরিণত হয়। মানব জীবনে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে 'যুক্তি' ও

www.pathagar.com

'আকাঙ্ক্ষা'র মধ্যে গোল বেধে যায় এবং মানুষের অশুভ (unhealthy) প্রবৃত্তি, সঙ্গত (rational) যুক্তির (argument) ছদ্মবেশে মানবতাকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পায় এবং অন্যায় (unjust) আচরণকে ন্যায়ের (justice) আবরণে উপস্থাপন করে। এটাই হচ্ছে মানব জীবনের সেসব ক্ষেত্র যেখানে মানবীয় বিচার-বুদ্ধি ঐশী নির্দেশনার প্রয়োজন বোধ করে; আর ঐশী নির্দেশনাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোন কোন আচরণ যুলুম বা অবিচারের মধ্যে পড়ে; যদিও বা কোন কোন ধর্মহীন যুক্তিবাদীর চোখে তা ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে হতে পারে। এসব বিষয়ে ঐশীবাণী যে বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে তার স্থান ভিন্ন মতের বিজ্ঞতাপূর্ণ সকল যুক্তির ঊর্ধ্বে। রিবার ক্ষেত্রে হুবহু এই একই কথা প্রযোজ্য। ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদীগণ বিশ্বাস করে যে, তারা যে সুদের কারবারে লিপ্ত হয়ে আছে তা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ ও সুবিচারপূর্ণ; তারা মনে করে, সুদের মাধ্যমে তারা যে আয় করছে তা ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা অর্জিত মুনাফার মতই। তাই এরা সুদের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তাদের বিচার বুদ্ধিজাত যুক্তি তুলে ধরেছে। আল-কুরআন তাদের সে যুক্তি উদ্ধৃত করেছে। বলা হয়েছে:

ক্রয়-বিক্রয় তো রিবার মতই (২-২৭৫)।

১২৭. তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ক্রয়-বিক্রয়ে মুনাফা দাবী করা যদি বৈধ ও ন্যায়ানুগ হয়, তবে ঋণের ওপর সুদ ধার্য করা অন্যায় ও অবৈধ হবে কেন-এর কোন কারণ নেই। তাদের এ যুক্তির উত্তরে আল-কুরআন যুক্তিপূর্ণভাবে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য তুলে ধরতে পারত এবং ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিতে পারত যে, ক্রয়-বিক্রয়ে মুনাফা কেন ন্যায় সঙ্গত; আর ঋণের ওপর সুদ কেন অবৈধ। কিন্তু আল-কুরআন ইচ্ছা করেই যুক্তির এ ধারা পরিহার করেছে এবং সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় এর জওয়াব দিয়েছে। বলেছে:

আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম।

১২৮. এ আয়াত জানিয়ে দিচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের লেনদেনে কোন অন্যায় অবিচার আছে কি না তা নির্ণয় করার দায়িত্ব এককভাবে মানবীয় বিচার-বুদ্ধির (human reason) ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। কারণ এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব যুক্তি ও মতামত নিয়ে হাজির হতো এবং মতের এত বিভিন্নতা সৃষ্টি হতো যে, সার্বজনীন প্রয়োগযোগ্য চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো একেবারে অসম্ভব। সুতরাং বিশুদ্ধ নীতি হচ্ছে যে, আল্লাহ যখন কোন বিশেষ লেনদেনকে হারাম ঘোষণ করেন, তখন কেবল মানবীয় বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে সে বিষয়ে দ্বিমত কর কোন সুযোগ থাকে না, কারণ আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এমন সব বিষয় পর্যন্ত পরি সাধারণ মানবীয় যুক্তি যেখানে পৌঁছতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মানবীয় বিচার-বুদ্ি

www.pathagar.com

সকল বিষয়ে সঠিক ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতো তাহলে ঐশী হেদায়েতের কোন প্রয়োজনই থাকতো না। মানব আচরণের এমন বহু দিক আছে যেখানে স্রষ্টা বিশেষ কোন আদেশ প্রদান করেননি। এসব ক্ষেত্রে মানবীয় বিচার-বুদ্ধি এর যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে; কিন্তু যেখানে সুস্পষ্ট ঐশী নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেখানে এর প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার দায়িত্ব মানবীয় বিচার-বুদ্ধিকে দেওয়া উচিত নয়।

১২৯. আল-কুরআনে রিবার অবিচার ও জুলুম সংক্রান্ত আয়াতগুলো এই প্রেক্ষাপটকে সামনে নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:
এবং যদি তওবা কর (সুদ খাওয়া থেকে), তাহলে তোমার আসল তোমারই। তোমরা অবিচার করবে না, তোমাদের উপরও অবিচার করা হবে না।

১৩০. জুলুম সম্পর্কে বলার পূর্বেই আল-কুরআন সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ঋণের আসলের ওপর কোন অতিরিক্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ঋণদাতা তওবা করেছে বলে গণ্য করা হবে না; অপরদিকে ঋণদাতা তার পরিপূর্ণ আসল ফেরত পাবার অধিকারী হবে এবং ঋণগ্রহীতা তার গৃহীত আসল ঋণ পুরোপুরি ফেরত দানে বাধ্য থাকবে। এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা যদি আসল ফেরত না দেয়, তাহলে সে ঋণদাতার ওপর জুলুম করবে; আর ঋণদাতা যদি আসলের ওপর অতিরিক্ত দাবী করে তাহলে সে ঋণগ্রহীতার ওপর অবিচার করবে।

১৩১. এভাবেই আল-কুরআন নিজেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কোনটি জুলুম আর কোনটি জুলুম নয়; তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের ওপর ছেড়ে দেয়নি। সুতরাং মানুষের বিচার-বুদ্ধির মুল্যায়ন দ্বারা সুদী লেনদেনের হারাম-হালাল নির্ণীত হতে হবে এই ধারণার বাস্তব অর্থ দাঁড়াবে, এ ব্যাপারে ঐশী নির্দেশনার উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করা; তাই তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

সুদ নিষিদ্ধ করার মৌলিক কারণ

১৩২. এখন আমরা যুক্তিতর্কের দ্বিতীয় পর্যায়ে আসছি। সরকার পক্ষ হতে যুক্তি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে যে, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ঋণের সুদে যুলুম ও বে-ইনসাফীর কিছু নেই।

১৩৩. সুদী ঋণ আদান-প্রদানে কি কি জুলুম ও বে-ইনসাফী আছে এ ব্যাপারে স্বয়ং আল-কুরআনই সিদ্ধান্ত দিয়েছে; আর আল-কুরআনের বক্তব্যই যথেষ্ট ও চূড়ান্ত। তাছাড়া সকলের পক্ষে সুদের যাবতীয় কুফল, বে-ইনসাফী ও জুলুম সম্পর্কে জানা, বুঝা ও উপলব্ধি করতে পারা জরুরী নয়। বলা যায়, আজকের দুনিয়ায় সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যত ব্যাপক ও প্রকট হয়ে উঠেছে, অতীতে কখনও তা হয়নি। পূর্বকালে সুদী ভোগ্য

www.pathagar.com

ঋণ লেনদেন হতো ব্যক্তি পর্যায়ে, আর এর কুফল সীমিত থাকত ঋণ-গ্রহীতা পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিক কালের সুদী ঋণ ব্যবস্থা যেমন ব্যাপক, এর কুফল, জুলুম ও বে-ইনসাফীও তেমনি বিস্তৃত। এ ঋণের কুফল ছড়িয়ে পড়ে গোটা অর্থনীতিতে, বিপর্যস্ত করে দেয় সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে। বস্তুতপক্ষে, সুদ হারাম হওয়ার কারণগুলো সংখ্যায় এত বেশী যে, এগুলোর বিস্তারিত ফিরিস্তি তৈরী করতে গেলে বিরাট একটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে সে অবকাশ নেই; এখানে আমরা কেবল এর তিনটি দিকের ওপর আমাদের আলোচনা সীমিত রাখব। সেগুলো হচ্ছে:

ক. তাত্ত্বিক বিচারে সুদ নিষিদ্ধ করার কারণ;
খ. উৎপাদনের ওপর সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং
গ. বন্টনের ওপর সুদের অশুভ প্রভাব।

১৩৪. তাত্ত্বিক কারণ আলোচনায় আমরা দুটো মৌলিক বিষয়ে আলোকপাত করবো। এর প্রথমটি হচ্ছে অর্থের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঋণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।

অর্থের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১৩৫. সুদের সকল তত্ত্বই ভ্রান্ত অনুমিতির ওপর ভিত্তিশীল। আর এই ভ্রান্ত অনুমিতিগুলোর মধ্যে একটি অনুমিতি হচ্ছে যে, এতে অর্থকে একটি পণ্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে; এই অনুমিতির ওপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে, অন্যান্য সকল পণ্য যেমন বিক্রয় করা যায় তেমনি অর্থকেও ক্রয়-বিক্রয় করা যায়; একজন ব্যবসায়ী যেমন খরচ মূল্যের চেয়ে বেশী দামে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে; তেমনি একজন অর্থের মালিক তাঁর অর্থকেও এর ফেস ভ্যালুর চেয়ে অধিক দামে বিক্রি করতে পারে। অথবা কোন ব্যক্তি যেমন তার স্থায়ী সম্পদ ইজারা দিয়ে তার ওপর ভাড়া আদায় করতে পারে, তেমনি অর্থের মালিকও অর্থ ধার দিয়ে তার ওপর সুদ দাবী করতে পারে।

১৩৬. অর্থ সম্পর্কে এরূপ ধারণা বা অনুমিতি ইসলামী নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অর্থ অর্থই, আর পণ্য পণ্যই; দুটো সম্পূর্ণ আলাদা, এদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যও সম্পূর্ণ পৃথক। এ বিষয়ে কতিপয় মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগ নেই। অর্থকে সরাসরি ব্যবহার করে মানুষের কোন প্রয়োজন মেটানো যায় না। অর্থ দ্বারা কেবল অন্য কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায়। অপর দিকে পণ্যসামগ্রীর নিজস্ব উপযোগ আছে। পণ্যসামগ্রী সরাসরি ব্যবহার করে এ থেকে উপযোগ লাভ করা যায়; এজন্য অন্য কোন জিনিসের সাথে একে বিনিময় করতে হয় না বা পণ্যকে রূপান্তর না করেও ব্যবহার করা যায়।

www.pathagar.com

খ. পণ্যসামগ্রীর মধ্যে বহু ধরনের গুণাবলী বর্তমান; কিন্তু অর্থ কেবল মূল্য পরিমাপক বা বিনিময়ের মাধ্যম; এছাড়া আর কোন গুণ অর্থের নেই। সুতরাং কোন মুদ্রার বিশেষ মূল্যমানের সকল একক পরস্পর শতকরা ১০০ ভাগ সমমূল্যের অধিকারী হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১০০০/- টাকার একটি পুরানো ও ময়লাযুক্ত নোটের মূল্য ১০০০/- টাকার একটি আনকোরা নতুন নোটের মূল্যের সমান হয়ে থাকে।

গ. পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে বাছাই করা ও নির্দিষ্ট পণ্যের লেনদেন হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'ক' যদি একটি গাড়ি পছন্দ করে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সেই গাড়িটি ক্রয় করে আর বিক্রেতা যদি তার ক্রয় প্রস্তাবে সম্মত হয়, তাহলে 'ক' সেই নির্দিষ্ট গাড়িটি গ্রহণ করার অধিকারী হবে। ক্রেতা তাকে অন্য কোন গাড়ী নিতে বাধ্য করতে পারবে না, যদিও তা একই জাত ও গুণমানের হয়। অন্যদিকে ক্রেতাও বিক্রেতাকে অন্য কোন গাড়ী সরবরাহ করতে বাধ্য করতে পারবে না, যদিও তা একই জাত ও গুণমানের হয়।

কিন্তু পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে যখন মুদ্রা লেনদেন করা হয়, তখন কোন বিশেষ একটি মুদ্রা বা নোট নির্দিষ্ট করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ 'ক' ১০০০ টাকার একটি নির্দিষ্ট নোট দেখিয়ে 'খ'-এর কাছ থেকে কোন পণ্য ক্রয় করা সত্ত্বেও 'ক' তার সেই দেখানো নোটটি না দিয়ে অন্য কোন সমমানের নোটের দ্বারাও উক্ত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে।

১৩৭. অর্থ ও পণ্যসামগ্রীর মধ্যে বিদ্যমান উল্লেখিত পার্থক্যের কারণে ইসলামী শরীয়ত অর্থকে পণ্যসামগ্রী থেকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং অর্থের জন্য পৃথক নিয়মনীতি ও বিধান প্রদান করেছে, বিশেষ করে দুটি বিষয়ে-

১৩৮. প্রথমত, পণ্যসামগ্রীর ন্যায় (একই দেশের সম-মূল্যমানের) মুদ্রাকে কোন অবস্থাতেই ব্যবসায়ের পণ্য বানানো যাবে না। অর্থের মৌলিক যে উদ্দেশ্য রয়েছে, অর্থকে কেবল সে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে। এভাবে অর্থের ব্যবহার অর্থের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়েছে।

১৩৯. দ্বিতীয়ত, যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে অর্থের বদলে অর্থ বিনিময় করতে হয় (একই দেশের) অথবা যদি ঋণ হিসেবে অর্থ লেনদেন করা হয়, তাহলে উভয় পক্ষের লেনদেন অবশ্যই পরিমাণে সমান সমান হতে হবে, যাতে এমন কোন উদ্দশ্যে অর্থ ব্যবহৃত না হয়, যে উদ্দেশ্যে অর্থ সৃষ্টি করা হয় নাই। অর্থাৎ যাতে খোদ অর্থের ব্যবসা করা না হয়।

১৪০. ইসলামের ইতিহাসে প্রখ্যাত ফকীহ ও দার্শনিক ইমাম গাজালী (মৃত্যু ৫০৫ হিজরী) অর্থের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সেই প্রাচীন কালে। তিনি এ

www.pathagar.com

আলোচনা করেছেন সেইকালে যখন পাশ্চাত্য অর্থ তত্ত্বের কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইমাম গাজালী তাঁর আলোচনায় বলেছেন,

"দিরহাম ও দিনারের (অর্থের) আবিষ্কার আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের অন্যতম নেয়ামত। ... এগুলো হচ্ছে এমন পাথর যার নিজস্ব কোন ব্যবহার (usafruct) বা উপযোগ নেই। কিন্তু সকল মানুষেরই এগুলোর প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মানুষেরই তার খাওয়া, পড়া ইত্যাদি প্রয়োজন পূরণের জন্য বহু রকমের পণ্যসামগ্রীর দরকার হয়। কিন্তু কখনও কখনও এমন হয় যে, যে জিনিস তার দরকার তা তার নেই; আবার যা তার আছে তাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয় না। এ অবস্থা পণ্যসামগ্রীর বিনিময়কে অত্যাবশ্যকীয় করে তোলে। আর এজন্য এমন একটি পরিমাপক প্রয়োজন যার দ্বারা পণ্যসামগ্রীর দাম নিরূপণ করা সম্ভব হয়। কারণ বিনিময়ের পণ্যদ্রব্যের জাত, গুণ ও মান একরূপ নয়; আর ওজন, পরিমাণ ও গণনার দিক থেকেও এসবের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। কো.. একটি পণ্যের কত পরিমাণ অন্য আর একটি পণ্যের ন্যায্য দাম হবে তা নিরূপণ কর, অসম্ভব। সুতরাং এসব পণ্যের মধ্যে এমন একটি মধ্যস্থতাকারী দরকার যা সুবিচারের ভিত্তিতে প্রতিটি পণ্যসামগ্রী ও সেবার দাম নিরূপণ করতে পারে। ... সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ সকল সামগ্রীর মধ্যে বিচারক ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দিরহাম ও দিনার (অর্থ) সৃষ্টি করেছেন যাতে এর দ্বারা সকল প্রকার সম্পদের মূল্য পরিমাপ করা যায়। ... অর্থ মূল্যের পরিমাপক; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অর্থ নিজেই একটি পণ্য। অর্থ নিজে একটি পণ্য হলে অবস্থা এই হতো যে, কোন ব্যক্তি যখনই মনে করত যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে তার অর্থ ধরে রাখা দরকার, তখন সে এর ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করত। অপরদিকে যার অনুরূপ কোন উদ্দেশ্য নেই, সে এর ওপর এমন গুরুত্ব দিত না; ফলে সমগ্র ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। আল্লাহ অর্থ এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে তা এক হাত হতে অন্য হাতে আবর্তিত হয় এবং ন্যায়সংগতভাবে পণ্যসামগ্রীর মূল্য পরিমাপক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং অর্থের বিনিময়ে অন্যান্য সকল পণ্য ও সেবা পাওয়া সম্ভব হয়। অর্থের কাজকে সামনে রেখে বলা যায় যে, যার কাছে অর্থ আছে, তার কাছে যেন যাবতীয় পণ্যসামগ্রীই রয়েছে। কিন্তু কারো কাছে অর্থ না থেকে যদি কোন পণ্য, যেমন, কেবল কাপড় থাকে তা হলে এ কথা বলা যাবে না। কারণ যার কাছে কাপড় আছে, সে কেবল কাপড়েরই মালিক; তার যদি খাদ্যের প্রয়োজন হয়, আর খাদ্যের মালিক যদি কাপড়ের পরিবর্তে তার খাদ্য বিনিময় করতে রাজি না হয়; কারণ উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, খাদ্যের মালিকের কাপড়ের দরকার নেই, তার দরকার একটি পশু। সুতরাং এমন একটি জিনিস দরকার যা বাহ্যত কিছুই না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটিই সব কিছু। এটি এমন এক জিনিস যার

www.pathagar.com

কোন বিশেষ রূপ নেই; কিন্তু বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর সাথে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম। এটি আয়নার ন্যায়; আয়নার নিজস্ব কোন রং নেই; কিন্তু আয়না নিজের মধ্যে সকল রং এর প্রতিফলন ঘটাতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। অর্থ নিজেই কোন উদ্দেশ্য নয়; বরং সকল উদ্দেশ্য সাধনের একটি হাতিয়ার বা বাহন মাত্র।

সুতরাং যে কেউ অর্থ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত পন্থায় অর্থকে ব্যবহার করে, সে আসলে আল্লাহর নেয়ামতেরই অমর্যাদা করে। যে অর্থ মজুদ করে, সে প্রকৃতপক্ষে এর প্রতি অবিচার করে এবং অর্থের আসল উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে। তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত যে, তার শাসককে কারারুদ্ধ করে রাখে...।

আর যে অর্থকে সুদী কারবারে খাটায়, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং অবিশ্বাস করে; কারণ উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে অর্থের জন্ম; কেবল অর্থের জন্যই অর্থের সৃষ্টি হয়নি। অর্থকে যারা বাণিজ্যিক পণ্য বানিয়েছে এবং খোদ অর্থের কারবারে লিপ্ত হয়েছে, তারা প্রকারান্তরে অর্থকে এমন একটি পণ্যে রূপান্তর করেছে যা অর্থ সৃষ্টির মূল্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। আর যে উদ্দেশ্যে অর্থের জন্ম, তার বিপরীত উদ্দেশ্যে এর ব্যবহারই হচ্ছে প্রকৃত জুলুম বা বেইনসাফী। কাউকে খোদ অর্থের কারবার করতে দেওয়া হলে, অর্থই তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত হবে এবং মওজুদ অর্থের ন্যায় অর্থ তার কাছে আটক হয়ে পড়বে। কোন শাসককে কারারুদ্ধ করে রাখা অথবা কোন ডাক পিয়নকে মানুষের কাছে চিঠিপত্র পৌঁছানো থেকে বিরত রাখা বেইনসাফী বা জুলুম ছাড়া আর কি হতে পারে।[৭৬]

১৪১. অর্থের প্রকৃতি সম্পর্কে ইমাম গাজালী (র.) এই সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করেছেন ৯০০ শত বছর আগে। এর শতশত বছর পরে যে সকল অর্থনীতিবিদ দুনিয়ায় এসেছেন তারা প্রায় সকলেই গাজালীর এই ব্যাখ্যাকে যথার্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থ হচ্ছে বিনিময়ের একটি মাধ্যম এবং দাম পরিমাপের একটি হাতিয়ার, একথা প্রায় সকল অর্থনীতিবিদের নিকট সাধারণভাবে স্বীকৃত। অর্থের এই কাজকে স্বীকার করে নেয়ার পর স্বাভাবিক যুক্তিতে একথা আসে (logical out come) যে, অতঃপর অর্থকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু ইমাম গাজালী এই কথা যেরূপ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, পরবর্তী অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশই তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বরং আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ অর্থকে অন্যান্য পণ্যের মত একটি পণ্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন। আর এ কারণে তাঁরা এমন এক উভয় সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যার সন্তোষজনক কোন সমাধান দেয়া কখনও সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

অর্থনীতিতে সকল পণ্যসামগ্রীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একশ্রেণীর পণ্যসামগ্রী হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ের, যেগুলোকে সাধারণত ভোগ্য পণ্য বলে অভিহিত করা হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্য হচ্ছে উচ্চতর পর্যায়ের, যাকে বলা হয় উৎপাদনশীল পণ্য (productive goods)। যেহেতু অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগ নেই, তাই অর্থকে ভোগ্য পণ্যের (consumption goods) অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; আবার যেহেতু উৎপাদনশীল পণ্য ছাড়া আর কোন বিকল্পও নেই, তাই অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই অর্থকে উৎপাদনশীল পণ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু ন্যায়সংগত যুক্তির (logical arguments) দ্বারা একথা প্রমাণ করা যায়নি যে, অর্থ আসলেই একটি উৎপাদনশীল সামগ্রী। লুডউইগ ভন মাইসেস বর্তমান শতকের একজন সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

অর্থনৈতিক পণ্যের এই দুটি ভাগকে যদি আমরা চূড়ান্ত বিভাজন বলে মেনে নেই, তা হলে অর্থকে এর কোন না কোন ভাগের অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। আর অধিকাংশ অর্থনীতিবিদদের অবস্থা এটাই। যেহেতু অর্থকে ভোগ্য পণ্যের শ্রেণীভুক্ত করা একেবারেই অসম্ভব, সেহেতু একে উৎপাদনশীল পণ্যের অন্তর্ভুক্ত না করে কোন উপায় নেই।[৭৭]

১৪২. এ মতের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করার পর তিনি যে মন্তব্য করেন তা হচ্ছে:

এ কথা সত্য যে, অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই অর্থকে উৎপাদশীল পণ্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন; কিন্তু এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ (authority) যে যুক্তি দিয়েছেন তা অসিদ্ধ। যে কোন তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণিত হয় যুক্তি দ্বারা। উদ্ভাবক বা পেশকারীর নাম দ্বারা নয়।

এসব বিশেষজ্ঞদের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে বলা যায় যে, এ ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে তারা তাদের অবস্থানের পক্ষে যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করতে পারেননি।[৭৮]

১৪৩. উপরোক্ত মন্তব্য করার পর ভন মাইসেস উপসংহার টেনে বলেছেন:

এই দিক থেকে বিচার করলে অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত জিনিস হচ্ছে তাই, যাকে এ্যাডাম স্মিথ যথার্থ অর্থেই "মৃত মওজুদ" (Dead Stock) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যা ... কিছুই উৎপাদন করে না।

১৪৪. অতঃপর লেখক কীনসের তত্ত্বের প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। এ তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, অর্থ যেমন একটি ভোগ্য পণ্য নয়, তেমনি তা উৎপাদনশীল পণ্যও হতে পারে না; বরং অর্থ হচ্ছে বিনিময়ের একটি মাধ্যম মাত্র।[৭৯]

www.pathagar.com

১৪৫. অর্থের প্রকৃতি সম্পর্কে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর এর যুক্তিসংগত ফল (logical result) এটা হওয়াই উচিত ছিল যে, অর্থকে এমন একটি হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হবে না, যা দৈনিক ভিত্তিতে অধিক থেকে অধিকতর অর্থের জন্ম দিতে পারে; অথবা অর্থকে একটি বাণিজ্যিক পণ্য বানানো হবে না, যাতে একই জাতের একই মূল্যমানের মুদ্রার বিনিময় হয়। অর্থ ভোগ্য পণ্য নয়, আবার উৎপাদনশীল পণ্যও নয়; বরং অর্থ বিনিময়ের একটি মাধ্যম মাত্র। একথা মেনে নেয়ার পর অর্থকে লাভজনক ব্যবসায়িক পণ্য বানানোর আর কোন সুযোগ থাকে না; এর পরও যদি তা করা হয়, তাহলে খোদ মধ্যস্থতাকারীকেই পক্ষ বানানো হবে। কিন্তু সম্ভবত সুদ ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার অতি ব্যাপকতা ও প্রাধান্যের কারণে অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এ দিকে আর অগ্রসর হননি।

১৪৬. কিন্তু ইমাম গাজালী অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম-এ ধারণা বা মতবাদকে (concept) গ্রহণ করেছেন এবং একে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌছে দিয়েছেন। উপসংহার টেনে তিনি বলেছেন, একই জাতের মুদ্রা বিনিময়কালে এরূপ বিনিময়কে মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার বানানো যাবে না।

১৪৭. ইমাম গাজালীর এই অভিমত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশনার ওপর ভিত্তিশীল। বাস্তববাদী কতিপয় স্কলারও একথা সত্য বলে স্বীকার করেছেন। এমনকি, সুদের প্রাধান্য আছে এমন সমাজের কিছু স্কলারও এ সত্য মেনে নিয়েছেন। এ সব স্কলারদের অনেকেই অর্থের কারবারকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা তাদের আর্থিক পদ্ধতির নিদারুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, অর্থের প্রধান কাজ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করা; অর্থের কাজকে এর মধ্যে সীমিত না রাখাই হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ (অন্যান্য কারণের সাথে)।

১৪৮. ১৯৩০-এর দশকে ভয়াবহ মন্দা চলছিল; এই বিপর্যয়কর অবস্থায় ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে সাউদাম্পটন চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক 'ইকোনমিক ক্রাইসিস কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে মি. ই. ডেনিস মান্ডির নেতৃত্বে দশ জন সদস্য ছিলেন। কমিটি তাদের প্রতিবেদনে (Report) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সৃষ্ট বিপর্যয়কর এ মন্দার মূল কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং সংকট উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ পেশ করেছে। প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরে এর প্রতিবিধানকল্পে কমিটি যেসব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে একটি সুপারিশ ছিল:

www.pathagar.com

অর্থ যাতে বিনিময় ও বন্টনের মাধ্যম হিসেবে সত্যিকার অর্থে এর যথার্থ কাজ করতে পারে সেজন্য পণ্য হিসেবে অর্থের কারবার বন্ধ করা বাঞ্ছনীয়।[৮০]

১৪৯. এটাই হচ্ছে অর্থের সত্যিকার কাজ ও প্রকৃতি। একে আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করাই ছিল যথার্থ। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ নীতিকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। তবে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বর্তমানে ক্রমবর্ধমানহারে এ সত্য উপলব্ধি করছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন গ্রে 'অলীক প্রভাত' (False Dawn) নামে তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা গ্রন্থে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:

এটা অতি তাৎপর্যপূর্ণ যে, সম্ভবত বর্তমান সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে লেনদেন আশ্চর্যজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। দৈনিক প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের অর্থ বিনিময় হচ্ছে যা বিশ্ব বাণিজ্য মূল্যের পঞ্চাশ গুণেরও অধিক। এ লেনদেনের শতকরা ৯৫ ভাগই হচ্ছে ফটকামূলক; এতে অনেকেই 'ফিউচারস' ও 'অপশন'র ভিত্তিতে উদ্ভাবিত জটিল ও নতুন আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করছে। মাইকেল এলবার্টের মতে বিশ্বের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৯০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান, যা ফ্রান্সের বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) সমান এবং বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহে সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের চেয়ে প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশী।

এই অপ্রকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Virtual Economy) এক ভয়ংকর ক্ষমতা রয়েছে, যা মৌলিক (Underlying) ও প্রকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড ও বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। ১৯৯০ সালে বৃটেনের প্রাচীনতম ব্যাংক ব্যারিংস-এর পতনে এটাই দেখা গেছে।[৮১]

জন গ্রে এসব উদ্ভূত অর্থের (Derivatives) আকার ও পরিমাণ সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে যা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে উদ্ভূত অর্থের দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ। তবে উদ্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ বা মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী। রিচার্ড থমসন এ সম্পর্কে তাঁর 'এপোক্যালিপস রুলেট গ্রন্থে' উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিক থেকেই উদ্ভূত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং ১৯৯৬ সালে তা ৬৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, (অর্থাৎ ৬৪,০০০,০০০,০০০,০০০)। আপনি কি ভাবতে পারেন এর পরিমাণ কত বিরাট! আপনি যদি এসব ডলার বিল গুলোকে একটির মাথায় আর একটি বসিয়ে লম্বা করে সাজাতে থাকেন, তাহলে তা এতটা দীর্ঘ হবে যে, এখান থেকে সূর্য পর্যন্ত ৬৬ বার পৌঁছাবে অথবা চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছাবে ২৫,৯০০ বার।[৮২]

www.pathagar.com

১৫০. জেমস রেবার্টসন তাঁর সর্বশেষ গবেষণা গ্রন্থ 'ট্রান্সফ্যরমিং ইকোনমিক লাইফ পুস্তকে এ বিষয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:

আজকের অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থা অসৎ, পরিবেশগত দিক থেকে ধ্বংসাত্মক, আর অর্থনৈতিকভাবে অদক্ষ। 'অর্থকে অবশ্যই বাড়তে হবে', এই দৃষ্টিভঙ্গি উৎপাদনকে (এভাবে ভোগকে) প্রয়োজনীয় পরিমাণের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রচেষ্টার লক্ষ্যকে ঘুরিয়ে দেয়; যার জন্য প্রকৃত পণ্যসামগ্রী ও সেবা যোগানোর পরিবর্তে অর্থ দিয়ে অর্থ লাভ করার লক্ষ্যেই যাবতীয় প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়।

... এর ফলে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাসমূহের গতি পরিবর্তিত হয়ে প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী ও সেবা উৎপাদন ও যোগান দেওয়ার পথ থেকে সরে যায় এবং সকল প্রচেষ্টা কেবল অর্থ দ্বারা অর্থ বানানোর পথে পরিচালিত হয়। পৃথিবীব্যাপী প্রতিদিন যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার হস্তান্তরিত হয় তার কমপক্ষে শতকরা ৯৫ ভাগই হচ্ছে কেবল অবিমিশ্র আর্থিক লেনদেন (purely financial transaction)। প্রকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Real Economy) লেনদেনের সাথে এর কোন সম্পর্ক ও সংযোগ নেই।[৮৩]

১৫১. ইমাম গাজালী ঠিক এই কথাই বলেছেন নয়শত বছর পূর্বে। এ ধরনের অস্বাভাবিক কারবারের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে তিনি অন্যত্র আরও ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোল্লিখিত ভাষায়:

"রিবা (সুদ) এই জন্য নিষিদ্ধ যে, তা মানুষকে প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এটা এজন্য যে, যার অর্থ আছে তাকে যখন সুদের ভিত্তিতে সে অর্থ খটিয়ে, তাৎক্ষণিক লেনদেন (Spot Transaction) বা ঋণ আদান-প্রদানের মাধ্যমে, অধিকতর অর্থ উপার্জন করতে দেওয়া হয়, তখন সে নিজেকে প্রকৃত অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত করে পরিশ্রম ও কষ্ট করার চেয়ে সুদের ভিত্তিতে অর্থ বৃদ্ধি করার কৌশলকে সহজতর মনে করে। এ অবস্থা মানবতার স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে; কারণ প্রকৃত বাণিজ্যিক উৎকর্ষতা এবং শিল্প ও বিনির্মাণ (construction) ব্যতীত মানুষের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।"[৮৪]

১৫২. দেখা যাচ্ছে, ইমাম গাজালী তাঁর সেই প্রাথমিক যুগে উৎপাদনের ওপর প্রভাবশালী বা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী এমন আর্থিক উপাদানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে গেছেন যা অর্থের যোগান ও প্রকৃত দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান (wide gap) সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে এই ব্যবধানকেই মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত জন গ্রে এবং জেমস রবার্টসনের লেখায় অর্থের কারবারের ভয়ংকর ক্ষমতার (terrible potential) কথা বলা হয়েছে; এই

www.pathagar.com

ভয়ংকর ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান আসলে একই। আমরা পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা করব। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই সত্য যে, অর্থ হচ্ছে বিনিময়ের একটি মাধ্যম এবং মূল্য পরিমাপের একটি হাতিয়ার। সুদের তত্ত্বে অর্থকে যেরূপ একটি উৎপাদন সামগ্রী হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে, যা দৈনিক ভিত্তিতে মুনাফা বয়ে আনে, তেমনিভাবে অর্থকে উৎপাদন সামগ্রী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। অর্থ হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী। একে একান্তভাবে এই কাজই করতে দেওয়া উচিত। অর্থকে লাভজনক বাণিজ্যিক পণ্য বানানো হলে তা গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করবে এবং গোটা সমাজে বহুবিধ অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমস্যার জন্ম দেবে।

ঋণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১৫৩. ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং ইসলামী নীতিমালার মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে ঋণের প্রকৃতি বিষয়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ঋণকে নিখাদ একটি বাণিজ্যিক লেনদেন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যাতে তা ঋণদাতার জন্য নির্ধারিত আয় বয়ে আনতে পারে। অপরপক্ষে, ইসলাম ঋণকে আয়বর্ধনকারী লেনদেন হিসেবে অনুমোদন করে না। ইসলামী ব্যবস্থায় কেবল সেই সব ঋণদাতারাই ঋণ দেবে যারা ঋণের মাধ্যমে কোন পার্থিব বিনিময় লাভের আশা করে না। বরং তারা কেবল মানবিক কারণে ঋণ প্রদান করে যার লক্ষ্য থাকে পরকালে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া; অথবা অধিকতর নিরাপদ হাতে রেখে তাদের অর্থ হেফাজত করার লক্ষ্যে তারা ঋণ দেয়। কিন্তু বিনিয়োগ হচ্ছে ঋণ থেকে আলাদা; ইসলামে অংশীদারি পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি আছে; আয় অর্জন করতে হলে এসব বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু ঋণ লেনদেনকে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে না।

১৫৪. ইসলামের এই কর্ম-পরিকল্পনার (Scheme) পেছনে যে মৌলিক দর্শন রয়েছে তা হলো, কেউ যদি তার অর্থ অন্য কাউকে দিতে চায় তাহলে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে,

ক. সে দয়া-অনুগ্রহ বশত ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করছে কি না;

খ. সে এই জন্য তাকে অর্থ ধার দিচ্ছে কি না যাতে তার আসল অর্থ নিরাপদ থাকে;

গ. সে গ্রহীতার অর্জিত লাভে অংশীদার হওয়ার লক্ষ্যে তাকে অর্থ প্রদান করছে কি না।

www.pathagar.com

১৫৫. উপরে 'ক' ও 'খ' তে উল্লিখিত কারণে ঋণ দেয়া হলে, সে ক্ষেত্রে আসলের ওপর কোন প্রকার অতিরিক্ত দাবী করার অধিকার ঋণদাতার থাকে না; কারণ ক-এর ক্ষেত্রে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে নেহায়েত মানবিক কারণে অথবা দয়া বা অনুগ্রহ হিসেবে ঋণ প্রদান করেছে। আর খ-এর ক্ষেত্রে ঋণদাতা তার অর্থ নিরাপদ সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করেছে, অতিরিক্ত আয় অর্জনের লক্ষ্যে নয়।

১৫৬। যদি 'গ'-তে উল্লেখিত কারণ অর্থাৎ গ্রহীতার অর্জিত লাভে অংশীদার হওয়ার লক্ষ্যে অর্থ দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে দাতাকে গ্রহীতার লোকসানের ভাগও অবশ্যই বহন করতে হবে, যদি তার লোকসান হয়। আর এক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব নয়; বরং সে ক্ষেত্রে তাকে অপর পক্ষের সাথে যৌথ উদ্যোগে (joint venture) যেতে হবে। এই কারবারে উভয় পক্ষের যৌথ পুঁজি (joint stake) থাকবে এবং উভয়ে উত্তম পন্থায় কারবারের ফলাফল ভাগ করে নেবে। ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার লাভে অংশ নেয়ার ব্যবস্থা যদি সুদী ঋণের ভিত্তিতে স্থির করা হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ঋণদাতা বা অর্থায়নকারী, তাঁর নিজের লাভ নিশ্চিত করতে আর ঋণগ্রহীতাকে কারবারের খেয়ালী প্রকৃত ফলাফলের ওপর ছেড়ে দিতে চায়। পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে, ঋণগ্রহীতার গোটা কারবারই ফেল (Fail) করছে; সে অবস্থায় ঋণগ্রহীতাকে কারবারের সাকুল্য লোকসান তো বহন করতেই হবে; শুধু তাই নয়, বরং ঋণদাতার পাওনা সম্পূর্ণ সুদও পরিশোধ করতে হবে। এর অর্থ তো এটাই যে, ঋণগ্রহীতার সর্বস্ব খুইয়ে হলেও ঋণদাতার মুনাফা বা সুদের নিশ্চয়তা বিধান (Guaranteed) করতে হবে। এটা বে-ইনসাফীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

১৫৭. অপরপক্ষে যদি এমন হয় যে, ঋণগ্রহীতা কারবারে বিপুল মুনাফা লাভ করেছে, তাহলে তার একটি ন্যায়সংগত অংশ অর্থায়নকারীর পাওয়া উচিত। কিন্তু সুদী ব্যবস্থায় ঋণদাতার অংশ নির্দিষ্ট সুদের হার পর্যন্ত সীমিত থাকে; এই সুদের হার নির্ধারিত হয় অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা, কারবারে অর্জিত প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে নয়। কারবার যৌথ উদ্যোগের ভিত্তিতে হলে এবং কারবারে বিপুল লাভ হলে অর্থায়নকারী তার অংশে অধিক লাভ পেতে পারে। কিন্তু কারবারে অর্থায়ন যদি সুদের ভিত্তিতে হয়, কারবারে প্রচুর লাভ হলেও ঋণদাতা নির্ধারিত সুদের চেয়ে বেশী পায় না। সেক্ষেত্রে লাভের বিরাট অংশ ঋণগ্রহীতাই নেয় এবং একটা সামান্য অংশ সুদ হিসাবে ঋণদাতাকে প্রদান করে। এটি ঋণদাতার ওপর একটি অবিচার।

১৫৮. সুতরাং কারবারে অর্থায়ন ব্যবস্থা সুদী ঋণের উপর ভিত্তিশীল হলে, তা এক ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করে, যা পরিস্থিতি অনুসারে অবশ্যই কোন না কোন বে-

www.pathagar.com

ইনসাফী ও যুলুম বয়ে আনে। কখনও ঋণগ্রহীতার ওপর চরম যুলুম চাপিয়ে দেয়, কখনও আবার ঋণদাতাকে অবিচারের শিকার বানায়। ইসলামী শরীয়তের বিচক্ষণতা এখানেই যে, শরীয়ত সুদ ভিত্তিক ঋণকে কারবারে অর্থায়ন করার পদ্ধতি হিসেবে অনুমোদন করেনি।

১৫৯. সুদ নিষিদ্ধ করা হলে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে সুদী ঋণের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত হয়ে আসবে এবং গোটা আর্থিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে ইক্যুইটির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এবং এর পেছনে থাকবে প্রকৃত সম্পদ (Real asset)। ইসলামী শরীয়ত চায় ঋণের সীমিত ব্যবহার। এজন্য শরীয়ত কেবলমাত্র অনিবার্য প্রয়োজনের তাকিদেই ঋণ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করে আয়েশি জীবন যাপনের জন্যে ঋণ গ্রহণ অথবা বিত্ত-বৈভব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঋণের ব্যবহারকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে দেখা যায়, একবার এক ঋণগ্রস্ত লোক মারা গেল; রাসূল (সা.) যখন জানতে পারলেন মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত তখন তিনি তার নামাযে জানাযা পড়ানো থেকে বিরত থাকলেন। ঋণ গ্রহণ করা যাতে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বা দৈনন্দিন বিষয়ে পরিণত না হয় এ নীতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই রাসূল (সা.) উক্ত ঋণগ্রস্ত মৃতের জানাযা পড়াননি। রুজি-রোজগারের সকল প্রচেষ্টা নিঃশেষ হওয়ার পর অনন্যোপায় হয়েই কেবল ঋণের দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার এটিও অন্যতম কারণ। কেননা, সুদ নিষিদ্ধ হলে ঋণের ওপর বাড়তি ধার্য করে আয় করার অবকাশ থাকবে না। এমতাবস্থায় ঋণগ্রহীতার বাহুল্য ব্যয় বা অপ্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর সুবিধার্থে অথবা তার কোন লাভজনক প্রকল্পের জন্য কেউ সুদমুক্ত ঋণ প্রদানে আগ্রহী হবে না। এভাবে ঋণ গ্রহণ করে বাহুল্য ব্যয় করার অবকাশ থাকবে না। অপরদিকে লাভজনক প্রকল্প হলে তা মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেই গড়ে তোলা (design) হবে। এভাবে ঋণের পরিধি ও ক্ষেত্র ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত থাকবে।

১৬০. অপরদিকে একবার যদি সুদকে অনুমোদন করা হয় এবং ঋণের লেনদেন নিজেই যদি লাভজনক কারবারে পরিণত হয়, তাহলে গোটা অর্থনীতিই সুদ-ভিত্তিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং তা প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর প্রভাবশালী হয়ে উঠে। আর বারবার আঘাত (shocks) হেনে অর্থনীতির স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। সর্বোপরি গোটা মানব জাতিকে ঋণের দাসানুদাসে পরিণত করে। এ কথা অবিদিত নয় যে, উন্নত দেশগুলোসহ দুনিয়ার প্রায় সকল দেশই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঋণের তলায় ডুবে আছে। এর মধ্যে অধিক সংখ্যক দেশের পরিশোধ যোগ্য ঋণের বোঝা তাদের নিজ নিজ দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণকেও ছাড়িয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্যের কথা উল্লেখ করে যেতে পারে। ১৯৬৩ সালে যুক্তরাজ্যে

www.pathagar.com

গৃহস্থালী ঋণের (Household loan) পরিমাণ ছিল সে দেশের বার্ষিক আয়ের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ। কিন্তু ১৯৯৭ সালে সেখানে গৃহস্থালী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের মোট বার্ষিক আয়ের শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এ তথ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বৃটেনের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে দেশব্যাপী গৃহস্থালী ঋণের পরিমাণ তাদের মোট বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশী। ভোক্তারা ঋণ গ্রহণ করে তাদের ভবিষ্যত সম্ভাব্য উপার্জনের বিনিময়ে ভোগ্য পণ্য ক্রয় করেছে। যার জন্য তাদের ঋণের পরিমাণ তাদের সার্বিক বার্ষিক আয়কে ছাড়িয়ে গেছে।[৮৬] পিটার ওয়ারবারটন যুক্তরাজ্যের একজন অতি সম্মানিত আর্থিক কমেনটেটর (মন্তব্যকারী) এবং অর্থনৈতিক ফোরকাস্টিং পুরস্কার বিজয়ী। তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: *ঋণ ও পুঁজির বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে; কিন্তু এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে। ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত হও যা পাশ্চাত্যের আর্থিক ব্যবস্থার ভিতকে উলটপালট করে দিবে।*[৮৭]

সুদের সামগ্রিক ফলাফল

১৬১. সুদ ভিত্তিক ঋণের একটি স্থায়ী প্রবণতা হচ্ছে যে, তা সর্বদাই সাধারণ মানুষের স্বার্থের মোকাবিলায় ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ হাসিল করে। সম্পদ বরাদ্দ (resource allocation) এবং উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পাশাপাশি সুদ সম্পদ বন্টন ক্ষেত্রেও মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুদের সৃষ্ট কতিপয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

ক. সম্পদ বরাদ্দে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

১৬২. বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণ প্রধাণত তারাই পায় যারা বিত্তশালী, ঋণের বিপরীতে সন্তোষজনক জামানত (collateral) দেওয়ার ক্ষমতা যাদের আছে। এই মোকদ্দমার অন্যতম জুরিস কনসাল্ট, সৌদি আরব মনিটারি এজেন্সির সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. এম. ওমর চাপরা সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরেছেন:

'সুতরাং লেস্টার থুরোর মতে যারা যোগ্য বা দক্ষ (smart or meritocratic) তারা নয়, বরং ভাগ্যবানরাই কেবল ঋণ পায়।[৮৮] এভাবে ব্যাংক ব্যবস্থা পুঁজি বন্টনে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়।[৮৯] যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ বৃহৎ ব্যাংক মর্গান গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানীও স্বীকার করেছে যে, ব্যাংকিং পদ্ধতি ক্রমোন্নতিশীল (maturing) ছোট ছোট কোম্পানী অথবা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টকে অর্থায়নে ব্যর্থ হয়েছে; এবং যদিওবা এদের ঋণ দেয়, তাহলেও প্রতিযোগিতামূলক দামে অর্থায়নে আগ্রহী হয় না; কিন্তু বৃহৎ ও সর্বাধিক নগদ অর্থের অধিকারী কোম্পানীকে অর্থ যোগান দেয় অপেক্ষাকৃত

www.pathagar.com

কম সুদের হারে।[৯০] যদিও জনগণের বৃহত্তর অংশের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর জমাকৃত অর্থই ব্যাংকের আমানতের প্রধান উৎস, তবু এ অর্থের সুবিধা প্রধানত বিত্তশালীরাই ভোগ করে (ড. এম. ওমর চাপরার দাখিলকৃত লিখিত বক্তব্য পৃ.১৮)।

১৬৩. ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য থেকে উপরে উল্লিখিত বক্তব্যের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। স্টেট ব্যাংকের তথ্যে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৮ সালে ২,১৮৪,৪১৭ জন জমাকারীর মধ্যে মাত্র ৯২৬৭ জন জমাকারী (মোট জমাকারীর মাত্র ০.৪২৪৩%) সর্বমোট ৪৩৮.৬৭ বিলিয়ন রুপী ব্যবহার করেছে যা ব্যাংকসমূহ থেকে প্রদত্ত ঋণের ৬৪.৫ শতাংশ।[৯১]

খ. উৎপাদনের ওপর সুদের বিরূপ প্রভাব

১৬৪. সুদী ব্যবস্থায় শক্তিশালী সহায়ক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয় এবং ঋণের উদ্দেশ্য বা ব্যবহারকে (end-use) ঋণ বরাদ্দের প্রধান বিবেচ্য বিষয় বা মানদণ্ড (criterion) হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। এই ব্যবস্থা মানুষকে তাদের ক্ষমতা বহির্ভূত (beyond their means) ব্যয় বা আয়ের চেয়ে অধিক ব্যয় করতে প্ররোচিত করে। সুদী ব্যবস্থায় ধনীরা কেবল উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই ঋণ নেয় তা নয়; বরং তারা বাহুল্য ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোগের জন্যেও ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

অনুরূপভাবে সরকার যে অর্থ ধার করে তাও কেবল উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই গ্রহণ করে তা নয় বরং অনেক সময়েই সরকারের বাহুল্য ও যথেচ্ছাচার ব্যয় নির্বাহের জন্যও তারা ঋণ নেয়। তাছাড়া, এমন সব প্রকল্পের জন্যও সরকার ধার করে যা যথার্থ অর্থনৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহীত নয়; বরং তাদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সুদী ব্যবস্থায় সুদ দিতে পারলেই ঋণ পাওয়া যায়, এ কারণে এ ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন ঋণ গ্রহণ করাও সম্ভব হয়; আমাদের ঋণের বোঝাকে বৃদ্ধি করে ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছানো ছাড়া এসব ঋণ আমাদের আর কোন কাজে লাগে না। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে আমাদের (পাকিস্তান) বাজেটে মোট সরকারী ব্যয়ের শতকরা ৪৬ ভাগ রাখা হয়েছে ঋণ পরিশোধের জন্যে। অন্যদিকে মোট ব্যয়ের মাত্র ১৮% ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে উন্নয়নের জন্য যার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো উন্নয়ন খাতও শামিল রয়েছে।

গ. বন্টনের ওপর সুদের বিরূপ প্রভাব

১৬৫. আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, কারবারে সুদের ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হলে সে কারবারে যদি লোকসান হয় তাহলে তা ঋণগ্রহীতার জন্য চরম যুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; অপরদিকে কারবারে যদি খুব বেশী মুনাফা হয়, সে অবস্থায়ও

www.pathagar.com

ঋণদাতা বে-ইনসাফীর শিকার হয়। সুদী ব্যবস্থায় এ উভয়বিধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা সমভাবেই বিদ্যমান। এ ব্যাপারে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে ছোট ছোট বহু ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসতে বাধ্য হয়েছে। তবে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থায়নকারীদের (dipositors) ওপর যে যুলুম ও বে-ইনসাফী বয়ে আনে তা অধিকতর সুস্পষ্ট ও অত্যন্ত ব্যাপক যা সম্পদের সুষম বন্টন ক্ষেত্রে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

১৬৬. আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাংক হচ্ছে এমন এক প্রতিষ্ঠান যা আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ধার দেয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে বৃহৎ কারবারসমূহের তহবিলের যোগানদাতা। বহু ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা যায় যে, উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ ধার নেয় তার তুলনায় তাদের নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ হয় খুবই নগণ্য। উদ্যোক্তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ যদি হয় ১০.০০ মিলিয়ন তাহলে তারা ব্যাংক থেকে ধার করে ৯০.০০ মিলিয়ন এবং তা বিপুল লাভজনক কারবারে খাটায়। এর অর্থ হচ্ছে, প্রকল্পের ৯০% ভাগ গড়ে তোলা হয়েছে আমানতকারীদের অর্থের দ্বারা; আর অবশিষ্ট মাত্র ১০% ভাগ অর্থ যোগান দেওয়া হয়েছে নিজেদের পুঁজি দ্বারা। এই প্রকল্পে যদি বিপুল পরিমাণ মুনাফা হয়, তাহলে এর অতি নগণ্য অংশ আমানতকারীদের হাতে পৌঁছবে (সুদ হিসেবে বিভিন্ন দেশে) যার হার স্বাভাবিকভাবে ২% থেকে ১০% পর্যন্ত হয়ে থাকে; অথচ এই প্রকল্পে আমানতকারীদের সম্পদের অংশ হচ্ছে শতকরা ৯০% ভাগ। আর বাকী সাকুল্য মুনাফা নিয়ে যায় বড় বড় সব উদোক্তারা, যদিও প্রকল্পে তাদের নিজস্ব প্রকৃত অবদানের পরিমাণ শতকরা ১০% ভাগের অধিক নয়। বিষয়টি এখানেই শেষ হয় না; বরং জমাকারী সাধারণ মানুষদের সুদ আকারে যে সামান্য অংশ প্রদান করা হয়, উদ্যোক্তাগণ সেটুকুও ফিরিয়ে এনে নিজেদের পকেটে তোলে। কারণ ব্যাংক থেকে অর্থ ধার নেয়ার বিনিময়ে উদ্যোক্তারা ব্যাংককে যে সুদ দেয় উৎপাদন খরচ হিসেবে তা পণ্যের দামের সাথে যুক্ত হয় এবং পণ্যের বর্ধিত মূল্য আকারে জমাকারীদের প্রাপ্ত সুদ আবার উদ্যোক্তাদের কাছেই ফিরে আসে। *[ব্যাংক জমাকারীদের যে হারে সুদ দেয় উদ্যোক্তা তথা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে তার চেয়ে অধিক হারে সুদ নেয়। এই অধিক হারের সুদই উৎপাদন খরচ হিসেবে দ্রব্যমূল্যের সাথে যুক্ত হয়ে দ্রব্যমূল্যকে সমহারে বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং জমাকারীগণ তাদের জমাকৃত অর্থের ওপর যে হারে সুদ পায়, পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রীর দাম আকারে তার চেয়ে অধিক হারে সুদ ফেরত দিতে তারা বাধ্য হয়-অনুবাদক]* এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ ফলাফল (net result) এই দাঁড়াচ্ছে যে, কারবারে অর্জিত মুনাফার এক বিরাট অংশ তারাই পায়, কারবারে যাদের নিজস্ব আর্থিক অবদান মোট বিনিয়োগের

www.pathagar.com

১০% ভাগের বেশী নয়; অপরদিকে কারবারে মোট বিনিয়োগের ৯০% ভাগ অর্থের আসল যোগান দাতা জমাকারীগণ প্রকৃত অর্থে কিছুই পায় না। কারণ তাদের জমার উপরে যে সুদ প্রদান করা হয় পণ্যসামগ্রীর বর্ধিত দামের মাধ্যমে তা ফেরত দিতে তারা বাধ্য হয় *(বরং তার চেয়ে বেশী ফেরত দিতে বাধ্য হয়- অনুবাদক)*। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রকৃত আয় হয় নেতিবাচক।

১৬৭. উপরে বর্ণিত অবস্থায় যখন দেখা যায় যে, ব্যাংকগুলোর প্রদত্ত ঋণের ৬৪.৫% ভাগ নিয়ে যায় মাত্র ০.৪২৪৩% ভাগ জমা হিসাবধারীরা, তখন এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মিলিয়ন মিলিয়ন জমাকারীদের অর্থ খাটিয়ে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার সিংহভাগই চলে যায় মাত্র ৯,২৬৯ জন ঋণগ্রহীতার পকেটে। এ থেকে যে কেউ উপলব্ধি করতে পারে যে, সুদ ভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা আমাদের বন্টন ব্যবস্থায় কী ভয়ংকর বৈষম্য সৃষ্টি করে! আর অতীতের ভোগ্য ঋণের সুদের সৃষ্ট বে-ইনসাফী যা কেবল কতিপয় ব্যক্তিকে আঘাত করত, তার তুলনায় গোটা সমাজব্যাপী সৃষ্ট আধুনিক বাণিজ্যিক সুদের অবিচার কত ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক!

১৬৮. বর্তমান সুদী ব্যবস্থা কিভাবে গরীবদের সর্বস্বান্ত করে ধনীদের আরও ধনশালী করে তোলে, সুদের এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন জেমস রবার্টসন। তিনি লিখেছেন, *অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদ যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে তার ফলে স্বল্পবিত্তের লোকদের কাছ থেকে অর্থ নিয়মিতভাবে অধিক বিত্তশালীদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। গরীবদের নিকট থেকে ধনীদের কাছে সম্পদ হস্তান্তরের এই প্রক্রিয়া প্রকটভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তৃতীয় বিশ্বে সৃষ্ট ঋণ-সংকটের মাধ্যমে। তবে সম্পদ হস্তান্তরের এ প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সুদের মাধ্যমে এভাবে সম্পদ হস্তান্তর অংশত একারণে হয় যে, ধার দেওয়ার মত অর্থ যাদের বেশী আছে তারা সে অর্থ সুদে ধার দিয়ে, যাদের অর্থ কম তাদের চেয়ে, অধিক সুদ অর্জন করে। আর এটা এ কারণেও হয় যে, যাদের সম্পদ কম তাদেরকে প্রায়শই বেশী ধার করতে হয়। (যার ওপর অধিক সুদ দিতে হয় বলে তাদের সম্পদ কমে যায়, আর ঋণদাতাদের সম্পদ বেড়ে যায়- অনুবাদক)। তাছাড়া সুদের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরের এটাও একটা প্রক্রিয়া যে, বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদনে যে ব্যয় হয়, সুদজনিত ব্যয় হচ্ছে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। আর বিত্তশালীদের অর্থায়নেই আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী ও সেবার ব্যাপকতর উৎপাদন হয়ে থাকে। আমরা যখন অর্থ ব্যবস্থাকে এ দৃষ্টিতে দেখি এবং যখন একটি সক্ষম ও অবিকৃত অর্থনীতির অংশ হিসেবে সুন্দর সুচারুরূপে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করার উপযোগী অর্থ ব্যবস্থা পুনঃরূপায়ণের কথা ভাবি, তখন একবিংশ শতকের অর্থ ব্যবস্থা হিসেবে একটি সুদমুক্ত মুদ্রাস্ফীতিবিহীন অর্থব্যবস্থার পক্ষে যুক্তির বলিষ্ঠতাই অধিক বলে প্রতীয়মান হয়।*[৯২]

www.pathagar.com

১৬৯. একই লেখক তাঁর অন্য আর এক গ্রন্থে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

অর্থ ও অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে গরীব লোকদের নিকট হতে ধনীদের কাছে, দরিদ্র এলাকা থেকে বিত্তশালী এলাকায় এবং দরিদ্র দেশ থেকে ধনশালী দেশে আয় হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি হচ্ছে নিয়মানুগ (systematic)... । দরিদ্রদের থেকে ধনীদের কাছে সম্পদ হস্তান্তরের একটি কারণ হচ্ছে অর্থনীতিতে সুদ প্রদান ও গ্রহণের প্রক্রিয়া ।[৩]

ঘ. কৃত্রিম মুদ্রা সম্প্রসারণ ও মুদ্রাস্ফীতি

১৭০. সুদী ঋণের সাথে প্রকৃত উৎপাদনের বিশেষ ও সুনির্ধারিত কোন সম্পর্ক থাকে না; অর্থায়নকারী তাদের প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে বলিষ্ঠ সহকারী জামানত (strong collateral) গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে; অতঃপর সাধারণত ঋণগ্রহীতা তার গৃহীত ঋণের অর্থ কিভাবে ব্যবহার করছে সে ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করে না। ফলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাজারে যে অর্থের সরবরাহ ঘটে বিশ্বে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও সেবার সাথে তার কোন মিল থাকে না। এ অবস্থা বাজারে অর্থের পরিমাণ এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণের মধ্যে গুরুতর অসংগতি সৃষ্টি করে। এটা অবশ্যই অন্যতম একটি মৌলিক কারণ যা মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় অথবা মুদ্রাস্ফীতিকে অধিকতর ফাঁপিয়ে তোলে।

১৭১. আধুনিক ব্যাংকের সুপরিজ্ঞাত একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাকে সাধারণত 'অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ব্যাংকের এ ক্ষমতা মুদ্রাস্ফীতিকে ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ের পুস্তকেও ব্যাংকের এই অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লেখা হয়েছে; এসব পুস্তকে কখনও কখনও পরম আত্মতৃপ্তির সাথে লেখা হয়, কীভাবে ব্যাংকগুলো অর্থ সৃষ্টি করে। আপাতদৃষ্টিতে একে ব্যাংকের একটি যাদুকরি কাজ বলে মনে করা হয় এবং কোন কোন সময়ে একে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক বলেও বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আধুনিক ব্যাংকের ধারকগণ এই ধারণা বা ক্ষমতার অন্তরালে লুকায়িত প্রতারণার জাল খুব কমই উন্মোচন করে থাকেন।

১৭২. ব্যাংকের 'অর্থ সৃষ্টির' এই ক্ষমতা কখন কোথা থেকে এলো সে ইতিহাস জানতে হলে মধ্য যুগীয় ইংল্যান্ডের স্বর্ণকার বা গোল্ডস্মীথদের কাহিনীতে যেতে হবে। সেকালে ইংল্যান্ডের লোকেরা তাদের স্বর্ণমুদ্রা গোল্ডস্মীথদের কাছে আমানত রাখত; আর স্বর্ণকার জমাকারীদের এ মর্মে রসিদ প্রদান করত। প্রক্রিয়াটি সহজ করার লক্ষ্যে স্বর্ণকারগণ 'বাহক রসিদ' (bearer receipts) দিতে শুরু করল। কালক্রমে

www.pathagar.com

এই বাহক রসিদই স্বর্ণমুদ্রার স্থান দখল করে নেয় এবং লোকেরা এই বাহক রসিদের দ্বারাই তাদের দায় দেনা পরিশোধ করতে আরম্ভ করে। এই রসিদ ক্রমে বাজারে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করল। দেখা গেল যে, স্বর্ণ জমাকারী বা বাহক রসিদধারীদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশই কেবল তাদের জমাকৃত সোনা তুলে নেয়ার জন্য স্বর্ণকারদের কাছে আসে। এ অবস্থা লক্ষ্য করে স্বর্ণকারগণ তাদের কাছে গচ্ছিত স্বর্ণের কিছু অংশ গোপনে গোপনে ধার দিতো এবং এভাবে ধার দিয়ে সুদ অর্জন করতে লাগল। কিছুকাল পর স্বর্ণকারগণ আবিষ্কার করল যে, তারা তাদের কাছে জমাকৃত অর্থের চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ স্বর্ণ গচ্ছিত থাকার কাগুজে সার্টিফিকেট) ছাপিয়ে নিতে পারে এবং এই অতিরিক্ত অর্থ (কাগুজে রশিদ) সুদে ধার দিতে পারে। তারা তাই করল। আর এটাই হচ্ছে অর্থ সৃষ্টি বা আংশিক রিজার্ভ ভিত্তিক ঋণের (Fractional Reserve Lending) গোড়ার কথা। এর অর্থ হচ্ছে, কারও কাছে জমা হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত আছে তার চেয়ে অধিক অর্থ ঋণ প্রদান করা। এভাবে গোল্ডস্মীথগণ নিশ্চিত ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় রিজার্ভের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস এবং নিজস্বভাবে সৃষ্টি করা ঋণের অনুপাত বৃদ্ধি করতে থাকলো এবং ক্রমান্বয়ে তাদের কাছে গচ্ছিত প্রকৃত স্বর্ণের চার, পাঁচ, এমনকি দশ গুণ পর্যন্ত স্বর্ণ জমার সার্টিফিকেট ধার দেওয়া শুরু করল।

১৭৩. প্রথমদিকে এটা ছিল স্বর্ণকারদের বিশ্বাসঘাতকতা ও নিছক একটি প্রতারণা। সমতা (equity), সুবিচার ও সততার কোন মাপকাঠিতে তা সমর্থনযোগ্য ছিল না। এটা ছিল এক ধরনের জালিয়াতি এবং মুদ্রা ইস্যুকারী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর কতৃত্বে অন্যায় হস্তক্ষেপ। কিন্তু কাল পরিক্রমায় এই প্রতারণামূলক কাজই আধুনিক ব্যাংকের 'আংশিক রিজার্ভ' (Fractional Reserve) পদ্ধতির অধীনে কায়দা-দোরস্ত (Fashionable) সাধারণ মানে (Standard Practice) পরিণত হয়েছে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন শাসকের প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও অর্থ বিনিময়কারী (money changers) ও ব্যাংকারগণ বেসরকারি ব্যাংক কর্তৃক অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতাকে কিভাবে আইনসিদ্ধ করে নিতে সক্ষম হলো, রোথচাইল্ডস কিভাবে গোটা ইউরোপের ওপর, আর রকফেলার সমগ্র আমেরিকার ওপর আর্থিক ক্ষমতা লাভ করলো, সে ইতিহাস অতি দীর্ঘ। বেসরকারী ব্যাংক কর্তৃক অর্থ সৃষ্টির ধারণার সমর্থনে উদ্ভাবিত অসংখ্য তত্ত্বের ভীড়ে সে ইতিহাস হারিয়ে গেছে-তলিয়ে গেছে সে কাহিনী। সর্বশেষ ফলাফল (net result) এই দাঁড়িয়েছে যে, আধুনিক ব্যাংক 'নাই' (nothing) থেকে অর্থ সৃষ্টি করছে। ব্যাংকগুলোকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে; তারা তাদের কাছে জমা স্বরূপ সংরক্ষিত মোট অর্থের দশগুণ বেশী অর্থ ঋণ প্রদান করতে পারে। সরকার যথার্থ অকৃত্রিম এবং ঋণ-মুক্ত (Debt-free) যে মুদ্রা ও নোট ইস্যু করে তা হচ্ছে বাজারে প্রচলিত মোট

www.pathagar.com

অর্থের একটি ক্ষুদ্র নগণ্য অংশ মাত্র। এছাড়া বাজারে প্রচলিত অর্থের বিরাট অংশই হচ্ছে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে সৃষ্ট কৃত্রিম অর্থ। অনেক দেশে সরকারের ইস্যুকৃত প্রকৃত অর্থের অনুপাত ক্রমাগতভাবে হ্রাস করা হচ্ছে; অপরদিকে ব্যাংক কর্তৃক 'নাই' থেকে সৃষ্ট কৃত্রিম অর্থের অনুপাত ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে চলেছে। ঋণের ওপরে ঋণ দ্বারা নির্মিত পর্বতচূড়াই হচ্ছে আজকের অর্থের বৃহত্তর অংশ। উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সে দেশে মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৮০ বিলিয়ন পাউন্ড; এর মধ্যে মুদ্রা ও নোট হিসেবে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত মুল ঋণমুক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৫ বিলিয়ন পাউন্ড। বাকী সব অর্থ অর্থাৎ ৬৫৫ মিলিয়ন পাউন্ডই ছিল ব্যাংক কর্তৃক শূন্যের ওপরে সৃষ্ট বুদ্বুদ মাত্র। ব্যাংক সৃষ্ট এই বুদ্বুদের পরিমাণ প্রতিবছর কিভাবে বেড়ে চলেছে নীচের টেবিলে উল্লেখিত যুক্তরাজ্যের বিশ বছরের সালওয়ারী অর্থ সরবরাহের পরিসংখ্যান থেকে তা সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে।

সাল	সরকারি ভাবে ইসুকৃত মোট মুদ্রা ও মোট (এম,ও) স্টারলিংপাউন্ড (বিলিয়নে)	মোট অর্থের পরিমাণ (এম,ও) বিলিয়নে,	মোট অর্থ সরবরাহের মধ্যে প্রকৃত ঋণ-মুক্ত অর্থের শতকরা হার
১৯৭৭	৮.১	৬৫	১২%
১৯৭৯	১০.৫	৮৭	১২%
১৯৮১	১২.১	১১৬	১০.৫%
১৯৮৩	১২.৮	১৬১	৭.৯%
১৯৮৫	১৪.১	২০৫	৬.৮%
১৯৮৭	১৫.৫	২৬৯	৫.৮%
১৯৮৯	১৭.২	৩৭২	৪.৬%
১৯৯১	১৮.৬	৪৮৫	৩.৮%
১৯৯৩	২০.০	৫২৫	৩.৮%
১৯৯৫	২২.৪	৫৮৫	৩.৮%
১৯৯৭	২৫.০	৬৮০	৩.৬%

১৭৪. উক্ত টেবিলে[৯৫] দেখা যাচ্ছে যে, বিগত দুই দশক ধরে ক্রমাগতভাবে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৯৭ সালে এর পরিমাণ ৬৮০ বিলিয়ন পাউন্ড উন্নীত হয়েছে। টেবিলের সর্বশেষ কলামে দেখা যাচ্ছে যে, মোট অর্থ সরবরাহের মধ্যে প্রকৃত অর্থের শতকরা হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে;

www.pathagar.com

১৯৭৭ সালে যেখানে মোট অর্থের ১২% ভাগ ছিল প্রকৃত অর্থ, ১৯৯৭ সালে এই হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩.৬% ভাগে।

১৭৫. এই তথ্য থেকে দুটি বাস্তব দিক স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রথমত, দেখা যাচ্ছে যে, মোট অর্থ সরবরাহের শতকরা ৯৬.৪ ভাগ অর্থই হচ্ছে ঋণ থেকে উদ্ভূত বা ঋণ-নির্ভর (debt-ridden); আর অবশিষ্ট মাত্র শতকরা ৩.৬% ভাগ অর্থ হচ্ছে ঋণ-মুক্ত। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সমগ্র অর্থনীতি কিভাবে ঋণের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এ তথ্য থেকে এ সত্য প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মোট অর্থ সরবরাহের শতকরা ৯৬.৪% ভাগই হচ্ছে কেবল সংখ্যা; কম্পিউটার দ্বারা এ সংখ্যা সৃষ্টি করা হয়েছে, এর পেছনে বাস্তব দ্রব্যসামগ্রী বা সেবার কোন অস্তিত্ব নেই।

১৭৬. যুক্তরাজ্যের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রেও প্রায় একই অবস্থা বিরাজ করছে। প্যাট্রিক জে,এস, কারম্যাক এবং বিল স্টিল বলেছেন:

কেন আমরা আমাদের মাথায় ঋণের বোঝা বহন করে চলছি? কারণ আমরা এমন একটি ঋণ নির্ভর অর্থ ব্যবস্থায় (debt money system) কাজ করছি যেখানে আমাদের সমগ্র অর্থই সমপরিমাণ ঋণের সাথে সমান্তরালভাবে সৃষ্টি করা হয়। বেসরকারি ব্যাংকগুলো নিজেদের স্বার্থে এর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তারা অর্থ সৃষ্টি করে, তা সুদে ধার দেয়, আর আমরা পাই ঋণ...।

... সুতরাং, যদিও ব্যাংকগুলো মুদ্রা (currency) সৃষ্টি করে না এ কথা ঠিক, তবে তারা নতুন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে চেক বই অর্থ বা আমানত (deposits) সৃষ্টি করে। এমনকি, এভাবে সৃষ্ট অর্থের কিছু অংশ তারা বিনিয়োগও করে। বস্তুত বেসরকারীভাবে সৃষ্ট অর্থের মধ্য থেকে এক ট্রিলিয়ন ডলারের চেয়ে অধিক অর্থ ব্যয় করে খোলা বাজারে মার্কিন বন্ড কেনা হয়েছে; এ থেকে ব্যাংকগুলো মোটামুটি ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সুদ অর্জন করেছে; এ পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ব্যাংক কর্তৃক তাদের কতিপয় আমানতকারীকে প্রদত্ত সুদ বাদ দেওয়ার পর। এভাবে আংশিক রিজার্ভ ভিত্তিক ঋণের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো মোট অর্থের শতকরা ৯০% ভাগের বেশী অর্থ সৃষ্টি করে। সুতরাং শতকরা ৯০% ভাগ মুদ্রাস্ফীতি তারাই ঘটিয়ে থাকে।[৯৬]

১৭৭. যদিও অর্থের প্রচলিত পরিমাণ তত্ত্বে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুদের হার নিয়ন্ত্রণসহ নানা উপায়, কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এর কোনটাই রোগের নিরাময়ক নয়। এসব সমাধান সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী; তাছাড়া এগুলোর নিজস্ব এমন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা অর্থনীতিকে বাণিজ্য চক্রের উথাল-পাথালের মধ্যে খাবি খাওয়াতে থাকে। এ ব্যাপারে মাইকেল রোবোথাম যথার্থই বলেছেন:

www.pathagar.com

সরকার সুদের হার হ্রাস অথবা সুদের হার বাড়িয়ে এই কাজই (আর্থিক ব্যবস্থাপনা) করে। সুদের হার হ্রাস করে সরকার ঋণ গ্রহণকে উৎসাহিত করে, বাজারে অর্থ সৃষ্টির গতি বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। অপরদিকে সরকার সুদের হার বাড়িয়ে ঋণগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে, অর্থ সৃষ্টির গতি শ্লথ হয়ে আসে এবং অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর হয়ে পড়ে ...। সুদের হারের হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এভাবে ঋণ সম্প্রসারণ ও ঋণসংকোচন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।...

বস্তুত, এই পদ্ধতি হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি কৌশল, একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু এই পদ্ধতিতে নতুন ঋণ ঠেকানোর লক্ষ্যে সুদের হার বাড়ানো হলে পূর্বের ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি ও কারবারের ওপর আকস্মিক আঘাত এসে পড়ে, তাদের পূর্বের ঋণের ওপর অধিক হারে সুদ প্রদানে বাধ্য হতে হয়। এটি একটি বড় অবিচার ও যুলুম; কিন্তু সে অনুভূতি আজ হারিয়ে গেছে; ধর্মীয় প্রত্যয়ের মত এই আদর্শের চার পাশে পরিব্যাপ্ত কট্টর বিশ্বাসের মধ্যে তা বিলীন হয়ে গেছে।...

ব্যাংক, মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের এ পদ্ধতি নিশ্চয়ই কাজ করে; এটা কাজ করে সেইভাবে যেভাবে মুরগীর রোস্ট কাটার ক্ষেত্রে একটি স্লেজ হাতুড়ী (Sledge Hammer) কাজ করে। অর্থ সরবরাহের জন্য ঋণের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি এমন এক আর্থিক পদ্ধতিতে বন্দী হয়ে পড়েছে যেখানে ঋণ ও অর্থ সরবরাহ উভয়ই দ্রুত সম্প্রসারিত হয়; আর যে ঋণ গ্রহণের জন্য অর্থনীতি বাধ্য হয়েছে সে ঋণের জন্যই অর্থনীতি শাস্তি প্রাপ্ত তথা দুর্দশায় নিপতিত হয়। অসংখ্য অতীত ঋণ গ্রহীতাকে দেউলিয়া বানিয়ে পথে বসানো হয়, বেশুমার লোককে বাড়ি ঘর থেকে উৎখাত ও বেদখল করা হয়, কারবারগুলোকে ধ্বংস করা হয় এবং মিলিয়ন মিলিয়ন কর্মক্ষম মানুষকে বেকারত্বের অভিশাপের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় যতক্ষণ না মুদ্রাস্ফীতি ও অতি গরম অবস্থাকে বিপদজনক বিবেচনা না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঋণকে নিরুৎসাহিত করা হতে থাকে এবং অর্থনীতি মানুষের দুর্দশার স্থবির সাগরে রূপ নেয়। অবশ্য এ অবস্থায় পৌঁছার সাথে সাথে চাহিদা পড়ে যায়; সুতরাং আমাদেরকে সুদের হার হ্রাস করতে হয় এবং ভোক্তাদের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। সমগ্র অর্থনীতিতে আবার বাণিজ্য চক্র শুরু হয়। এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কিছুই হতে পারে না যে, আর্থিক ব্যবস্থাকে বুঝা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আধুনিক অর্থনীতি চরম ও পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নির্বিচারে গোটা অর্থনীতিকে ফাঁদে বন্দী করা, অতঃপর একে মুগুড় পেটা করা ব্যতীত আধুনিক অর্থনীতি আর কিছুই করতে পারে

www.pathagar.com

না। কিন্তু এটা এমন এক নীতি যা অন্যায়ের দ্বার খুলে দেয় এবং সেই সাথে নৈতিক বিচ্যুতিকে উদ্বুদ্ধ করে। পরিবর্তনশীল সুদের হারের ভিত্তিতে ঋণের সুদের হার পুনর্নির্ধারণের যে অসীম ক্ষমতা অর্থায়নকারীকে দেওয়া হয়, সেই ক্ষমতাবলে অর্থায়নকারী অতি চতুরতার সাথে ঋণ-চুক্তিতে ইচ্ছামত একতরফাভাবে সুদের হার পুণঃনির্ধারণ করে নেয়।[৯৭]

১৭৮. তদুপরি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্ট এই ভিত্তিহীন অর্থ আজ 'ফিউচারস' এবং 'অপশনস' রূপে উদ্ভূত অর্থের (derivatives) মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে ফটকা কারবারের বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রারম্ভিককালে অর্থের ওপর দাবীকে (claims over money) অর্থই মনে করা হতো। কিন্তু এখন দাবী হচ্ছে দাবীর ওপর দাবী (claim over claim)। আর একে সে অর্থেই বিবেচনা করা হয়। এক গণনায় বলা হয়েছে যে, বিশ্বে সর্বমোট ১৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক পরিমাণ উদ্ভূত অর্থ (derivatives) প্রচলিত আছে। অথচ বিশ্বের ১৮৮টি দেশের মধ্যে সবগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনের (GDP) যোগফল হচ্ছে মাত্র ৩০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মত। এই কারবারের ৮০% ভাগেরই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে মাত্র দুই ডজন বৃহৎ ব্যাংক ও হেজ তহবিলের (hedge fund) হাতে।[৯৮]

ফলে বিশ্বের গোটা অর্থনীতির অবস্থা হচ্ছে একটা বিরাট বেলুনের মত। প্রতিদিন নতুন ও নবতর আর্থিক লেনদেনের দ্বারা এই বেলুন ফাঁপিয়ে তোলা হচ্ছে ; অথচ প্রকৃত অর্থনীতির সাথে এর কোন সংগতি নেই। এই 'বেলুন' বেলুনের মতই দুর্বল; বাজারের আঘাতে (market shocks) যে কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে এ বেলুন। বস্তুত নিকট অতীতে এরকম ফেটে যাওয়ার ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছে, যার ফলে এশিয়ার ব্যাঘ্রগুলো ধ্বংসের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী এই আঘাত এত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে যে, বিশ্ব প্রচার মাধ্যমসমূহ, বাজার অর্থনীতি এর শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করছে বলে সমস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল।[৯৯] এখানে আমরা আবারও জেমস রবার্টসনের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। তিনি তাঁর রচিত অতি উৎকৃষ্ট মানের সৃষ্টি 'ট্রান্সফরমিং ইকোনমিক লাইফ: এ মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:

অর্থ বাড়তে হবে (money-must grow) এই অনুজ্ঞা পরিবেশগত দিক থেকে (ecologycally) ধ্বংসাত্মক...। এর ফলে মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদনের কাজ থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং অর্থ থেকে অর্থ উপার্জনে মগ্ন হয়ে পড়ে। বিশ্বে প্রতিদিন বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার হস্তান্তর

www.pathagar.com

হয়; এই লেনদেনের কমপক্ষে ৯৫% ভাগই হচ্ছে নিছক আর্থিক লেনদেন; এর সাথে প্রকৃত অর্থনীতিতে সংঘটিত লেনদেনের কোন সংযোগ নেই।

মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে উপলব্ধি করছে যে, অর্থ, ব্যাংক ও আর্থিক পদ্ধতির কার্যক্রম হচ্ছে অবাস্তব (unreal), অবোধ্য (incomprehensible), বে-হিসেবী (unaccountable), দায়িত্বহীন (irresponsible) শোষণমূলক (exploitative) এবং নিয়ন্ত্রণহীন (out of control)। কেন পৃথিবীর কোন এক দূর প্রান্তে গৃহীত একটি মাত্র আর্থিক সিদ্ধান্তের ফলে মানুষ বাস্তুহারা হতে বাধ্য হচ্ছে, তাদেরকে চাকরি খুইয়ে পথে বসতে হচ্ছে? কেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে গরীবদের সম্পদ ধনীদের হাতে চলে যাচ্ছে, গরীব দেশের সম্পদ বিত্তশালী দেশে গিয়ে পুঞ্জিভূত হচ্ছে? কিভাবে এক ব্যক্তি সিঙ্গাপুরে বসে টোকিও স্টক একচেঞ্জে জুয়া খেলতে সক্ষম হয় এবং কি করে সে লন্ডনের একটি ব্যাংকের পতন ঘটাতে পারে? ...লন্ডন নগরীতে কারবাররত উদ্ভূত অর্থের ব্যবসায়ী যুবকগণ কেন বছরে এত পরিমাণ বোনাস পায় যা সমগ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের চেয়েও অনেক বেশী? আমরা কি এমন একটি অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থা চেয়েছিলাম, যা এভাবে কাজ করে? অর্থায়নকারী জর্জ সোরোস পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "লেইসেজ-ফেয়ার পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য ব্যাপ্তি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাজার-মূল্যবোধের সম্প্রসারণ আমাদের মুক্ত (open) ও গণতান্ত্রিক সমাজকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে। আমি বিশ্বাস করি সাম্যবাদী নয় বরং পুঁজিবাদী হুমকিই মুক্ত সমাজের প্রধান দুশমন।"[১০০] (ক্যাপিটাল ক্রাইমস, আন্টলান্টিক মানথলি, জানুয়ারি, ১৯৯৭)।

১৭৯. সমগ্র বিশ্ব আজ উপরে উল্লেখিত যেসব ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তা অর্থনীতির ওপর প্রভুত্ব করার জন্য সুদী আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রদত্ত লাগামহীন ক্ষমতার যৌক্তিক পরিণতি। এরপরও কি কেউ দাবী করতে পারে যে, সুদের লেনদেনে কোন দোষ নেই! বস্তুত পূর্ববর্তীকালে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রচলিত সুদী ঋণ সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিকে প্রভাবিত করত; কিন্তু আজকের বাণিজ্যিক সুদ বিশ্বব্যাপী যে ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেক বেশী ব্যাপক ও মারাত্মক।

সুদ ও ইনডেক্সেশন

১৮০. কতিপয় আপীলকারী এই বলে সুদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, যেহেতু অর্থের মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, সেহেতু ঋণ পরিশোধের মেয়াদের মধ্যে অর্থের মূল্যের একটা অংশ ক্ষয় হয়ে যাবে বা হ্রাস পাবে; অর্থের মূল্যের এই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সুদ গ্রহণ করা উচিত। তাদের মতে ঋণদাতার

www.pathagar.com

অধিকার আছে যে, যে পরিমাণ অর্থ সে ঋণগ্রহীতাকে ধার দিয়েছিল, প্রকৃত মূল্যে, কমপক্ষে সেই পরিমাণ অর্থ সে ফেরত পাবে। কিন্তু তাকে যদি গাণিতিক অর্থে কেবল আসল পরিমাণই ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে সে সেই পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা ফেরত পাবে না যা সে ঋণগ্রহীতাকে দিয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থে প্রকৃত মূল্যের উল্লেখযোগ্য অংশ হ্রাস পাওয়ার দরুণ তার অর্থের প্রকৃত মূল্যে ঘাটতি হবে। সুতরাং তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে ঋণদাতার প্রদত্ত অর্থের মূল্যের যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতি পূরণ করার জন্য সুদ দেওয়া হয়।

১৮১. এই যুক্তিতে কোন বল নেই; সুদের হার মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই; তবে সুদের হার মুদ্রাস্ফীতির ওপর ভিত্তিশীল একথা ঠিক নয়। সুদ যদি মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিপূরণই হতো তাহলে সর্বদাই মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে সংগতি রক্ষা করে সুদের হার নির্ধারিত হতো। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। ঋণের চুক্তি সম্পাদনকালে বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতির হারের ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারিত হয় না; বরং সুদের হার নির্ধারিত হয় অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। যদি কখনও নির্ধারিত সুদের হার ও মুদ্রাস্ফীতির হার পরস্পর মিলে যায় তাহলে কেবল ঘটনাচক্রেই তা হতে পারে, নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণে নয়। সুতরাং সুদকে ক্রয়-ক্ষমতার মূল্য ক্ষয়জনিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য করা যায় না।

১৮২. অন্য আর এক পক্ষ থেকে মুদ্রাস্ফীতির বিষয়কে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা প্রচলিত সুদকে মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিপূরণ বলে দাবী করেননি; বরং তারা ঋণের ইনডেক্সেশনকে বর্তমান সুদভিত্তিক ঋণের একটি যথার্থ বিকল্প বলে বর্ণনা করেছেন, এবং তা গ্রহণ করে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যুক্তি প্রদর্শন করে তারা বলছেন যে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে যে অর্থ প্রদান করে মুদ্রাস্ফীতির দরুণ সে অর্থের মূল্যে ঘাটতি দেখা দেয়; ঋণদাতার অর্থের মূল্যের এ ঘাটতি পূরণ করা উচিত। সুতরাং ঋণদাতা মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে সংগতিশীল হারে অতিরিক্ত দাবী করতে পারে। তাদের মতে ব্যাংক ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুদের পরিবর্তে ইনডেক্সেশন পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

১৮৩. ঋণের ক্ষতিপূরণ (Indexation of loans) শরীয়াহ সম্মত কি না সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় যে, ব্যাংকের লেনদেন ক্ষেত্রে উক্ত পরামর্শ বাস্তবতা সম্মত নয়। কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণদাতার আসল অর্থের মূল্যের যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করে তাকে আসলের সমান সমান মূল্য ফেরত দেওয়াই ঋণের ক্ষতিপূরণ (Indexation of loan) ধারণার উদ্দেশ্য। আর মুদ্রাস্ফীতির একই হারে ব্যাংক এর আমানতকারীদের আমানতের ক্ষতিপূরণ যেমন করবে, তেমনি ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ব্যাংক তাদের প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণও একই হারে পাবে; কারণ উভয়ের হার নির্ধারিত হবে একই

www.pathagar.com

মানদণ্ড অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হারের ভিত্তিতে। ব্যাংক কর্তৃক আমানতকারীদের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের হার এবং ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের হারে কোন ব্যবধান থাকবে না। সুতরাং ব্যাংকের জন্য কোন আয় অবশিষ্ট থাকবে না; আর মুনাফা ব্যতীত কোন ব্যাংক চলতে পারে না। জনাব খালিদ এম ইসহাক, এ্যাডভোকেট ঋণ-ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার একজন সমর্থক। বেঞ্চের পক্ষ হতে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, "কেবল ইনডেক্সেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব"? উত্তরে তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন যে, এই মুহূর্তে তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না, তবে পরামর্শটি গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। আদালতের সহায়তার জন্য বেশ কয়েকজন ব্যাংকারও উপস্থিত ছিলেন; এদের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল জব্বার খান আদালতের সামনে তাঁর চূড়ান্ত মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ইনডেক্সেশনকে সুদের স্থলাভিষিক্ত করার যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ব্যাংকিং দৃষ্টিকোণ থেকে তা বাস্তব নয়।

১৮৪. উক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, মুদ্রাস্ফীতির যুক্তিতে প্রচলিত সুদের হারের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায় না ; তেমনি প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুদের বিকল্প হিসেবে ইনডেক্সেশনকে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়।

১৮৫. তবে ব্যক্তিগত ঋণ এবং অপরিশোধিত দেনার ক্ষেত্রে অর্থের মূল্য হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে ঋণদাতা সত্যিই অতিশয় কঠিন অবস্থায় নিপতিত হয়েছে, বিশেষ করে, যখন মুদ্রামান কল্পণাতীত অস্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে যায়; যেমন ঘটেছিল তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন এবং সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রসমূহে। এমনকি, আমাদের দেশেও ১৯৭০-সালের পূর্বে রুপীর যে মূল্য ছিল এখন তা অনেক কমে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন লোক যদি ১৯৭০-এর পূর্বে কাউকে ১০০০.০০ রুপী ঋণ দিয়ে থাকে; আর ঋণগ্রহীতা যদি আজও ঋণদাতার প্রাপ্য ১০০০.০০ রূপী ফেরত না দিয়ে থাকে, তাহলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো? অথচ প্রকৃত মূল্যে সেই দিনের ১০০০.০০ রূপীর আজকের দাম ১০০.০০ রুপীর বেশী নয়। এ প্রশ্ন অধিকতর তীব্রভাবে দেখা দেয় যখন ঋণদাতা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করে না।

১৮৬. এ সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন মহল থেকে বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব পরামর্শের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো:

ক. ঋণের ক্ষতিপূরণ করা উচিত; অর্থাৎ ঋণের মেয়াদকালে যে হারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, ঋণগ্রহীতাকে আসলের ওপর সেই সমহারে ধার্যকৃত অতিরিক্তসহ আসল ফেরত দিতে হবে।

www.pathagar.com

খ. ঋণকে স্বর্ণের সাথে যুক্ত করে দিতে হবে; ধরে নেওয়া হবে যে, কেউ ১০০০.০০ রুপী ধার নিলে, আসলে এ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ সোনা পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ স্বর্ণ সে ধার নিয়েছে। ঋণ ফেরত দানকালে দেখতে হবে এই একই পরিমাণ সোনা ক্রয় করতে কত রূপী লাগে। ঋণগ্রহীতাকে সেই পরিমাণ রুপী ফেরত দিতে হবে।

গ. ঋণকে মার্কিন ডলারের ন্যায় হার্ড কারেন্সি (Hard currency) অর্থাৎ যে মুদ্রার দাম সহজে হ্রাস পায় না, এমন মুদ্রার সাথে সংযোজন করে দেয়া উচিত।

ঘ. মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ঋণের মূল্যের যে ক্ষতি হবে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের তা সমহারে ভাগ করে নেয়া উচিত। অর্থাৎ অর্থের মূল্য যদি ৫% ভাগ হ্রাস পায়, তাহলে এর ২.৫% ভাগ দিবে ঋণগ্রহীতা, আর বাকী ২.৫% ভাগ ঋণদাতা বহন করবে। কারণ মুদ্রাস্ফীতি এমন একটি বিষয় যার ওপর ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা কারোই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া সাধারণ, তা সকলের ওপরই বর্তায়; সুতরাং উভয়ে মিলেই তা বহন করা উচিত।

১৮৭. কিন্তু আমরা মনে করি, এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। অত্র আদালতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বেই দেশের বিভিন্ন পাঠচক্র, বিশেষ করে, 'কাউন্সিল অব ইসলামিক ইডিওলোজি', এবং 'কমিশন ফর দি ইসলামাইজেশন অব ইকোনমি'-এর এ বিষয়ে গভীরভাবে ষ্টাডি করার প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে ইতিমধ্যে বেশ কয়টি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সেমিনারে উপস্থাপিত পেপারসমূহ এবং সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাবাবলী গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত।

১৮৮. অপর দিকে আদালতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্ষতিপূরণ (Indexation) যেমন সুদের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারে না, তেমনি ব্যাংকিং লেনদেনে সুদের বিকল্প হিসেবেও একে গ্রহণ করা যায় না। আর এই মোকদ্দমায় এখনই এ বিষয়ে আমাদের সমাধান করতে হবে ব্যাপার তাও নয়; তাছাড়া বিচারাধীন আইনগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের বিষয়ও এর ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং আরও গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার লক্ষ্যে আমরা বিষয়টি উন্মুক্ত রাখছি।

মার্ক-আপ ও সুদ

১৮৯. কয়েকজন আপীলকারী যুক্তি উপস্থাপন করে বলেছেন যে, আল-কুরআন ও সুন্নাহয় সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ; আর পাকিস্তানের ব্যাংকগুলো বর্তমানে সুদী কারবার করছে না; বরং তারা তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে মার্ক-আপ *(Mark-up)* নিচ্ছে। পাকিস্তানের কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষে বিজ্ঞ কাউন্সেল জনাব এস. এ. রহমান এ বিষয়ে বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং দেশের অর্থনীতি থেকে সুদ অপসারণের

www.pathagar.com

লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার এ যাবৎ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন তারও বর্ণনা তিনি আদালতের সামনে পেশ করেছেন। তার মতে ১/৪/৯৮ হতে পাকিস্তানের ব্যাংকিং খাত হতে প্রদত্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থায়নসহ সকল প্রকার অর্থায়নকে সুদমুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তার পূর্বে ১ জুলাই ১৯৯৫ হতে চলতি হিসাবে কোন লাভ দেওয়া হয় না বিধায় একমাত্র চলতি হিসাব ছাড়া অন্য সকল প্রকার হিসাবে সুদ ভিত্তিক আমানত গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং পিএলএস (লাভ-ক্ষতির অংশীদার) ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ১২টি অর্থায়ন পদ্ধতি অনুমোদন করেছে। এই পদ্ধতিগুলো সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। অর্থনীতি সম্পূর্ণ সুদমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সরকার ইতিমধ্যে বেশ কিছু অর্থায়ন আইনের সংশোধনও করেছে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে দেশের ব্যাংকিং লেনদেন ক্ষেত্রে বর্তমানে সুদের উপস্থিতি নেই। দেশের ব্যাংকগুলো এখন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক ঘোষিত ১২টি পদ্ধতিতে অর্থায়ন করছে। এই প্রেক্ষাপটে আপীলকারীদের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু ইতিমধ্যে সুদ উচ্ছেদ করা হয়েছে, সেহেতু প্রতিপক্ষের (Respondent) জন্য সুদের অবসান চেয়ে আবেদন করার কোন কারণ নেই।

১৯০. জনাব হাফিজ এস. এ. রহমান যে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তা অবশ্যই সত্য। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সুদমুক্ত অর্থায়নের সুবিধার্থে ১২টি পদ্ধতি অনুমোদন করেছে ঠিকই, কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা হলো, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই ১২টি পদ্ধতির মধ্যে সাধারণত ২ বা ৩ টি পদ্ধতি ব্যবহার করছে; এর মধ্যেও আবার মার্ক-আপ (Mark-up) পদ্ধতি ব্যবহার করছে সবচেয়ে বেশী। তদুপরি এই পদ্ধতির ব্যবহারও তারা এমনভাবে করছে যে, কার্যত লেনদেনের নাম পরিবর্তনের অধিক আর কিছুই হচ্ছে না। বাস্তবে তারা সুদের নাম বদলিয়ে তদস্থলে মার্ক-আপ নাম ব্যবহার করছে মাত্র। বস্তুত কাউন্সিল অব ইসলামিক ইডিওলোজি ১৯৮০ সালে অর্থনীতি থেকে সুদের অবসান সংক্রান্ত তাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করে। উক্ত রিপোর্টেই মূলত কাউন্সিল প্রথম মার্ক-আপ পদ্ধতির বিষয়টি উপস্থাপন করে। রিপোর্টে কাউন্সিলের পরামর্শ ছিল যে, মুশারাকাহ ও মুদারাবাহ ভিত্তিক লাভ-লোকসানে অংশীদারী পদ্ধতিই হচ্ছে সুদের প্রকৃত বিকল্প। তবে অর্থনীতিতে এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে মুশারাকাহ ও মুদারাবাহ ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। এই সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুবিধার্থে কাউন্সিল মার্ক-আপ পদ্ধতি প্রয়োগের পরামর্শ দেয়। ইসলামী ব্যাংকিং জগতে এই পদ্ধতি সাধারণত মুরাবাহা নামে সমধিক পরিচিত। এই পদ্ধতিতে অর্থায়নকারী ব্যাংক

www.pathagar.com

সরাসরি ঋণ আকারে অর্থ প্রদানের পরিবর্তে তাদের গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে পণ্যসামগ্রী বাজার থেকে ক্রয় করে; অতঃপর খরচ দামের ওপর ব্যাংকের মুনাফা যোগ করে গ্রাহকের কাছে বাকীতে বিক্রয় করে। এটা যথার্থ অর্থে অর্থায়ন নয়; বরং এটি গ্রাহকের নিকট মাল বিক্রয় করা। এই পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

ক. এই পদ্ধতি কেবল সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব যেখানে গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে আগ্রহী। গ্রাহক যদি ব্যাংকের নিকট থেকে মাল ক্রয় ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য যেমন, কারবারের স্থায়ী ব্যয় নির্বাহ, কর্মচারীদের বেতন প্রদান, কোন বিল অথবা দেনা পরিশোধ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ নিতে চায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না।

খ. এ পদ্ধতিতে লেনদেনকে যথার্থ অর্থে হালাল বা বৈধ করতে হলে ব্যাংককে বাস্তবে অবশ্যই মাল ক্রয় করতে হবে এবং ক্রীত মালের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল (physical and or constructive) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং ব্যাংকের মালিকানা ও দখলে থাকাকালীন সময়ে মালের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংককেই বহন করতে হবে।

গ. মাল ব্যাংকের মালিকানায় ও দখলে আসার পরই কেবল বৈধ বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করতে হবে।

ঘ. কাউন্সিল এ পরামর্শও দিয়েছিল যে, এ পদ্ধতির ব্যবহার যথাসম্ভব নিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে এবং কেবল সেসব ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করতে হবে যেখানে কোন কারণে মুশারাকাহ ও মুদারাবাহ পদ্ধতির ব্যবহার বাস্তবে সম্ভব নয়।

১৯১. দুর্ভাগ্যজনক যে, মার্ক-আপ পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগকালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখিত নিয়ম-কানুনের প্রতি আদৌ কোন লক্ষ্য রাখেনি। একে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করেছে; আসলে তারা কেবল সুদের নাম পরিবর্তন করেছে এবং এর স্থলে মার্ক-আপ নাম প্রতিস্থাপন করেছে। ফলে মার্ক-আপ নামে যা করা হচ্ছে প্রকৃত পণ্যসামগ্রীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে কোন মালের অস্তিত্বই থাকে না। আর কোন ক্ষেত্রে যদি মালের উপস্থিতি থেকেও থাকে, তাহলেও সে মাল ব্যাংকের ক্রীত মাল নয় এবং সে মাল দখলে আনার পর ব্যাংক বিক্রি করেছে তাও নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার পুনঃক্রয় (Buy-back) ব্যবস্থার ভিত্তিতে মার্ক-আপ পদ্ধতির অপপ্রয়োগও করা হচ্ছে; এর অর্থ হচ্ছে, গ্রাহক তার নিজ মালিকানাভুক্ত কোন জিনিস নির্ধারিত দামে ব্যাংকের নিকট বিক্রি করবে এবং তৎক্ষনাৎ উচ্চতর দামে ব্যাংকের কাছ থেকে সেটি কিনে নিবে। এটা মার্ক-আপের মূল ধারণার সাথে তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক ক্ষেত্রে কোন

www.pathagar.com

মাল সত্যিকার অর্থে ক্রয় ও বিক্রয় না করেই কেবল কাগজে-কলমে ক্রয়-বিক্রয় দেখানো হচ্ছে। অধিকন্তু কোন প্রকার বাছবিচার না করে ব্যাংকের সকল প্রকার অর্থায়ন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে; মালের সাথে এর আদৌ কোন সংযোগ আছে কি না সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করা হচ্ছে না। কারবারের স্থায়ী খরচ নির্বাহ, বিল পরিশোধ ইত্যাদি যাবতীয় উদ্দেশ্যে অর্থায়নে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। সর্বশেষ ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সুদী ব্যবস্থায় ব্যাংকের সম্পদের (asset side) দিক যেমন ছিল এখনও তেমনি রয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থবোধক কোন উন্নয়ন সাধন করা এখনও সম্ভব হয়নি। সুতরাং সুদের ব্যাপারে যে সব অভিযোগ ও আপত্তি আছে তার সবগুলো বর্তমানে পাকিস্তানে প্রচলিত মার্ক-আপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। একে কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থি ঘোষণা থেকে রেহাই দেয়া যেতে পারে না। সে মতে আমরা একে কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থি ঘোষণা করছি।

ক্বর্দ ও ক্বিরাদ

১৯২. আপীল নং-১ (এস) ১৯৯২-এর আপীলকারী হচ্ছেন ড. এম আসলাম খাকি। ফেডারেল শরীয়াহ কোর্টে মামলা চলাকালে এ মামলায় তিনি কোন পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু বিষয়টি সাধারণ গুরুত্বের, এজন্য আমরা তাঁর বক্তব্য শুনেছি। আপীল স্মারকে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা প্রায় হুবহু আমাদের যুক্তির অনুরূপ। কিন্তু আদালতে হাজির হয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোন অর্থায়নের বেলায় অর্থ গ্রহীতার লাভ-লোকসান নির্বিশেষে যদি অর্থের ওপর নির্ধারিত অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত করা হয় তাহলে সে অতিরিক্ত অবশ্যই রিবা বলে গণ্য হবে। কিন্তু আর্থিক লেনদেন কালে পক্ষদ্বয় যদি এ শর্তে একমত হয় যে, কারবারে লোকসান হলে উভয়ে তাদের পুঁজির অনুপাতে উক্ত লোকসান বহন করবে, তাহলে এ শর্তই উক্ত লেনদেন বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। অতঃপর তারা এ শর্তে একমত হতে পারে যে, মূল বিনিয়োগকালে অর্থদাতা যে অর্থ যোগান দিয়েছে তার ওপর নির্ধারিত হারে মুনাফা ধার্য করা থাকবে এবং কারবারে যখনই লাভ অর্জিত হবে তখনই অর্থায়নকারী তার পুঁজির ওপর উক্ত নির্ধারিত হারে মুনাফা পাওয়ার অধিকারী হবে। এ ধরনের লেনদেনকে ক্বিরাদ বলা হয়; শরীয়তে এরূপ লেনদেন নিষিদ্ধ নয়।

১৯৩. প্রথমত, এই দৃষ্টিভঙ্গি বিচারাধীন আইনগুলোকে প্রতিপক্ষের (Respondent) আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারবে না। কারণ এসব আইনে অর্থায়নকারীর জন্য তার প্রদত্ত অর্থের ওপর, যে কোনভাবেই হোক, নির্ধারিত আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তার আপীল উল্লেখিত আইনগুলোকে ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থি

www.pathagar.com

ঘোষণার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার এ পরামর্শ আমাদের ব্যাংকিং পদ্ধতির জন্য সুদের বিকল্প অনুসন্ধান প্রচেষ্টা পর্যায়ে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। তবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ তার এ মত সমর্থন করে না, এমনকি, বিগত চৌদ্দশত বছরে কোন ফিকাহবিদও একে সমর্থন করেননি। বস্তুত ক্বিরাদ ইসলামী আইনশাস্ত্রে ব্যবহৃত মুদারাবাহর সমার্থবোধক একটি পরিভাষা। ইসলামী ফিকাহর সকল স্কুলই এব্যাপারে একমত যে, মুদারাবাহ চুক্তিতে অর্থায়নকারীর জন্য তার মূল পুঁজির ওপর নির্ধারিত হারে কোন মুনাফা বরাদ্দ রাখা যাবে না। ইসলামী আইনবেত্তাগণ এধরনের যে কোন চুক্তিকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। আপীলকারীর যুক্তি আসলে স্ববিরোধী। কারণ একবার তিনি বলছেন, কারবারে লোকসান হলে অর্থ যোগানদাতা তার পুঁজির ওপর কোন মুনাফার হকদার হবে না। অন্যদিকে তিনি আবার বলছেন যে, অর্থদাতা তাঁর পুঁজির ওপর ১০% ভাগ হারে লাভ নির্ধারণ করেছে; কারবার লাভের মুখ দেখলেই অর্থায়নকারী তার পুঁজি ওপর উক্ত ১০% ভাগ হারে মুনাফা পাবার অধিকারী হবে। আর আপীলকারীর কাছে এটা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কারবারে সর্বসাকুল্যে যদি ১০% লাভ অর্জিত না হয়, তাহলে কি হবে? আপীলকারীর মত মেনে নিলে এক্ষেত্রে কারবারে অর্জিত সাকুল্য মুনাফা অর্থযোগানদাতা নিয়ে যাবে এবং মুদারিবের ভাগ্যে কিছুই জুটবে না, যদিও কারবার লাভ অর্জন করেছে। সুতরাং এ যুক্তি ভ্রান্ত।

রিবা ও অপরিহার্য আবশ্যকতার তত্ত্ব

১৯৪. সবশেষে, কতিপয় আপীলকারী রিবার ক্ষেত্রে জরুরীয়াতের (Necessity) তত্ত্ব টেনে আনার চেষ্টা করেছেন। হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সিদ্দিক আল-ফারুক বলেছেন, চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় জীবন বাঁচানোর তাক্বিদে আল-কুরআন, এমনকি, শূকর খাওয়ারও অনুমতি দিয়েছে। কোন কোন আপীলকারী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, আজকের দিনে সুদী ব্যবস্থা একটি বিশ্বজনীন অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং কোন দেশই এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। আল-কুরআন সুদ নিষিদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু বর্তমানকালে জাতীয় জীবনে এ নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করলে তা হবে আত্মহত্যার শামিল-তা সমগ্র অর্থনীতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। সুতরাং সুদকে ইসলামী বিধিমালার পরিপন্থি ঘোষণা করা উচিত নয়। অপর কয়েকজন আপীলকারী বলেছেন, আজকের দিনে গোটা বিশ্ব একটি আন্তর্জাতিক পল্লীতে (global village) পরিণত হয়েছে; এখানে কোন দেশের পক্ষেই বিচ্ছিন্ন ও একাকীত্বে থাকা সম্ভব নয়, বিশেষ করে, আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় সবটাই নির্ভর করছে প্রধানত সুদ ভিত্তিক বৈদেশিক ঋণের

www.pathagar.com

ওপর। এখানে যদি পাইকারীভাবে সুদের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয় তাহলে সব উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমগ্র অর্থনীতি আকস্মিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

১৯৫. আমরা এ যুক্তির ওপর যথার্থ গুরুত্ব দিয়েছি এবং কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও পেশাধারী আইনবিদের সহযোগিতায় বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছি। সন্দেহ নেই যে, ইসলাম বাস্তবমুখী ধর্ম; কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের প্রতি ইসলাম তার ক্ষমতা বহির্ভূত কোন আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব অর্পণ করে না। জরুরীয়াতের বিধান কুরআন-সুন্নাহরই একটি বিধান; শরীয়তবেত্তাগণ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। জনাব সিদ্দিক আল-ফারুক যথার্থই বলেছেন যে, আল-কুরআন ক্ষুধার্ত অবস্থায় শূকরের গোস্ত খাওয়ারও অনুমতি দিয়েছে, যদি সে সময়ে জীবন বাঁচানোর জন্য আর কোন হালাল খাদ্যবস্তু পাওয়া না যায়। কিন্তু ইসলাম জরুরীয়াতের বিধানে অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থবোধকতার কোন অবকাশ রাখেনি। মুসলিম আইনবেত্তাগণ আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জরুরী মুহূর্তে কোন অবস্থায় আল-কুরআনের আইনকে শিথিল করা যাবে, তার বিস্তারিত মানদণ্ড প্রদান করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, প্রয়োজনটি যথার্থই বাস্তব এবং এর মধ্যে কাল্পনিক কোন শঙ্কা বা ভীতি নেই; তাছাড়া এ মুহূর্তে হারাম পথে প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া আর কোন বৈধ উপায় নেই, এ সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে হবে। এই নীতিমালার আলোকে আমরা যখন সুদের বিষয়টি বিশ্লেষণ করি তখন দেখি যে, সুদ উচ্ছেদ করা হলে অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এই আশংকার মধ্যে বেশ কিছু অতিরঞ্জন রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টির বাস্তব ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা জরুরী। এ উদ্দেশ্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ লেনদেন ও বৈদেশিক লেনদেনের বিষয় পৃথক পৃথকভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ লেনদেন

১৯৬. অভ্যন্তরীণ লেনদেন থেকে সুদ উচ্ছেদের ফলাফল সম্পর্কে যে আশংকা ব্যক্ত করা হয় তা কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার ওপর ভিত্তিশীল। এমন অনেক লোক আছে যারা মনে করে যে, সুদ বিলোপ করা হলে ব্যাংকগুলো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে ব্যাংক কোন বিনিময় ছাড়াই ঋণ প্রদান করবে, আর জমাকারীগণ ব্যাংকে সংরক্ষিত তাদের অর্থের ওপর কিছুই পাবে না। ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এরূপ বিভ্রান্তিকর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতোপূর্বেই আমরা ইসলামে ঋণের ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি; আমরা দেখিয়েছি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কারবার ক্ষেত্রে ঋণের ভূমিকা খুবই সীমিত। আর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ইসলামীকরণ করা হলে

www.pathagar.com

তারা কোন বিনিময় ছাড়া ঋণ দেবে তা সঠিক নয়, বরং তারা লাভ-লোকসানে অংশীদারী ও অন্যান্য ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করবে। ইসলাম নির্দেশিত এসব বিনিয়োগ পদ্ধতির কোনটিতেই মুনাফা-শূন্য বিনিয়োগের কথা বলা হয়নি।

১৯৭. কিছু লোক আবার মনে করে যে, ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংক পদ্ধতির যথার্থ রূপায়ণ ও বাস্তবায়ন এখনও পূর্ণরূপে হয়নি; এ অবস্থায় তড়িঘড়ি করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় উত্তরণের অর্থ হবে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতার অন্ধকার জগতে ঝাঁপ দেওয়া, সেখানে যে কোন অজানা বিপদ আমাদের গোটা অর্থনীতিকে চরম ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে।

১৯৮. ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন কোন মহলের উল্লিখিত উদ্বেগের কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা। বিদ্যমান আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিগত তিন দশকে সৃষ্ট নতুন চিন্তা-চেতনা এবং ইসলামী ব্যাংকিং ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অজ্ঞতাই উক্ত আশংকার মূল ভিত্তি। বস্তুত ইসলামী ব্যাংকিং আজ আর কোন অবাস্তব ধারণা বা কল্পনা বিলাসীর স্বপ্ন নয়। বিগত ৫০ বছর যাবৎ ইসলামী আইনবেত্তা ও অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে নানামুখী গবেষণা করে যাচ্ছেন এবং ১৯৭০ সাল থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তব রূপ দিয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিগত তিন দশক ধরে বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইচএসবিসি (HSBC) লন্ডনের ইসলামী ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রধান জনাব ইকবাল আহমদ খান এই মামলায় জুরিস কনসাল্ট হিসেবে হাজির ছিলেন। জনাব ইকবাল আহমদ খান যথার্থই বলেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে এবং তা ৬৫টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে; এদের মোট পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধির গতি হচ্ছে বার্ষিক ১৫%। আগামী ২০০০ সাল নাগাদ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৯. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) উদ্যোগে ১৯৭৫ সালে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পথ প্রদর্শক হিসেবে জেদ্দায় প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)। প্রাথমিকভাবে সদস্য দেশসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থ যোগান দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আর্থিক লেনদেন করাই ছিল এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যাংক বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের নিজস্ব একটি গবেষণা কেন্দ্রও রয়েছে; এ গবেষণা কেন্দ্রে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যাপক

www.pathagar.com

গবেষণা কাজ পরিচালিত হচ্ছে। অত্র মামলায় আদালতকে সহায়তা করা, ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং চলমান ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী আর্থিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে উপস্থাপিত প্রস্তাবনার সম্ভাব্যতার ওপর আলোকপাত করতে পারেন এমন কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংককে অনুরোধ করা হয়েছিল। আদালতের এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক অনুগ্রহ করে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে এবং ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ড. আহমদ মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ মর্যাদাশীল প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। ব্যাংকের প্রেসিডেন্টসহ প্রতিনিধিদলের একাধিক সদস্য আদালতের সামনে তাদের বক্তব্য দিয়েছেন এবং প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে লিখিত প্রতিবেদনও পেশ করেছেন। তাদের বক্তব্য ও রিপোর্টের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ না করে এখানে তার সারসংক্ষেপ তাদের নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

"সাধারণভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং বিশেষভাবে, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত অভিজ্ঞতার সাথে সাথে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যে কোন মুসলিম দেশে জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব (feasible)। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ইসলামিক ব্যাংকস কর্তৃক সংকলিত তথ্য অনুসারে বর্তমানে বিশ্বে ১৭৬টি ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে এর ৪৭% ভাগ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়; ২৭% রয়েছে জিসিসি ও মধ্যপ্রাচ্যে; ২০% ভাগ আফ্রিকায় এবং ৬% ভাগ রয়েছে পশ্চিমা জগতে। এসব ব্যাংকে মোট ডিপোজিটের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; আর মোট সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ১৪৭.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট কার্যক্রমের শতকরা ৭৩ ভাগ আঞ্জাম দিচ্ছে জিসিসি ও মধ্যপ্রাচ্য। একা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ১৯৭৬ সালের আত্মপ্রকাশের পর থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ যোগান দিয়েছে। বিশ্বে আর্থিক সেবা শিল্পের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৭% হলেও ইসলামী ব্যাংকের প্রবৃদ্ধির গতি হচ্ছে ১০.৫০%। জিসিসি ও মধ্যপ্রাচ্য বাজারের শতকরা ৫০-৬০ ভাগ এখন ইসলামী ব্যাংকের দখলে।

ইসলামী ব্যাংকিং -এর দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, ইসলামী ব্যাংকিং অর্থনীতির বাস্তব খাত (Real Sector) বা বাস্তব পণ্য-সামগ্রী নিয়ে কারবার করে থাকে; ফলে এ ব্যবস্থা অর্থের প্রবাহ এবং পণ্য-সামগ্রী ও সেবা সরবরাহের মধ্যে সংগতি রক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অসাধারণ (Tremendous) স্থিতিশীলতা বহাল রাখতে সক্ষম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা-এর নিজস্ব প্রবর্তিত রাষ্ট্রে লাভ-লোকসানে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে; এভাবে ইসলামী ব্যাংক সমাজকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত রাখে; অর্থাৎ অর্থনীতি যদি মন্দা বা মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে নিপতিত হয় তাহলে সে অবস্থায় লাভ-লোকসানে অংশীদারী ব্যবস্থা রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির চালকদেরকে পুঞ্জিভূত সুদের অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ রাখে এবং ঋণ খেলাপী ও দেওলিয়াত্বের সংখ্যা নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনে।

২০০. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এখনও এর প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছে এবং একে অসংখ্য সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এজন্যে বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পাঠচক্র, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও বিশেষজ্ঞ দল। প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেমিনার, কর্মশালা এবং সম্মেলন; ইসলামী আইনবেত্তা, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও পেশাজীবীগণ এতে অংশ নিচ্ছেন; তারা বাস্তব সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন ও তারে সমাধানের লক্ষ্যে এসব অনুষ্ঠানে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

২০১. এ কথা ঠিক যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এখনও তার পরিপক্কতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি; এখনও এর বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে; হয়তো বেশ কিছু দুর্বলতাও এর আছে; এমন অনেক সমস্যা আছে যার সমাধান এখনও করা যায়নি। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক এ পর্যন্ত যে অগ্রগতি সাধন করেছে তা ইসলামী ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তি অপনোদনের পক্ষে যথেষ্ট; ইসলামী ব্যাংকিং একটি অবাস্তব উচ্চাভিলাষী ধারণা অথবা এদিকে যাত্রা করলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য–ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতি এসব বিভ্রান্তি দূর করতে সক্ষম হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। উপরে উল্লিখিত অবস্থা থেকে কমপক্ষে এতটুকু জানা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বেশ কিছু বুনিয়াদি কাজ করা হয়েছে। অর্থনীতি থেকে সুদ অপসারণ সম্পর্কিত কোন আলোচনা করতে হলে এই প্রেক্ষাপটকে অস্বীকার বা অবমূল্যায়ন করার কোন অবকাশ নেই।

২০২. স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম. আশরাফ জানজুয়াকে এ মামলায় এসবিপি-এর প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে। জনাব জানজুয়া আদালতে তার লিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন। বক্তব্যে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সুদ নির্ভর একটা গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে সুদমুক্ত ব্যবস্থায় রূপান্তর সম্পূর্ণ সম্ভব (feasible)। তবে বিভিন্ন দেশে বেসরকারী পর্যায়ের ব্যাংকগুলো বিচ্ছিন্নভাবে যত সহজে এ কাজ করেছে, গোটা ব্যবস্থাকে রপান্তর করার কাজ তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল ও চ্যালেঞ্জের।

www.pathagar.com

২০৩. আমরা এ বিষয়ে মোটেই অসচেতন নই যে, কোন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে সুদ অপসারণ করা অনেক বেশী জটিল ও চ্যালেঞ্জের। কিন্তু সেই সাথে এটাও জানি যে, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বেসরকারী ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে সুদমুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার তুলনায় সরকারীভাবে তা কায়েম করা অনেক বেশী সহজ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের সুদমুক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজ নিজ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কোন সহযোগিতা পাচ্ছে না। এসব বেসরকারী ইসলামী ব্যাংককে সেই সব আইন কাঠামো এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তাবলীর অধীনে কাজ করতে হচ্ছে যা মূলত সুদ ভিত্তিক অর্থায়নের জন্য প্রণীত হয়েছে। এসব আইন ও শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির অনুকূলে কিছুমাত্র পরিবর্তনও করা হয়নি। অথচ সুদী ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকের ওপরও তা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করা হচ্ছে। বস্তুত ইসলামী ব্যাংকগুলোর হাত বাঁধা রয়েছে প্রচলিত সুদ ভিত্তিক আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তাবলীর কাছে। কিন্তু কোন সরকার যদি জাতীয় পর্যায়ে সুদমুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে এগিয়ে আসে তাহলে এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন কাঠামো ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধানও সরকার প্রণয়ন ও চালু করবে। ফলে বেসরকারী ইসলামী ব্যাংকগুলো বর্তমানে যে অসুবিধা মোকাবিলা করছে সেটা সরকারের জন্য আর কোন সমস্যা হয়ে থাকবে না। তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সাথে একই ময়দানে কাজ করতে হচ্ছে এবং প্রচলিত ব্যাংকের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধায় সন্তুষ্ট হতে না পারলে যে কোন গ্রাহক ইসলামী ব্যাংক ছেড়ে প্রচলিত ব্যাংকে চলে যেতে পারে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে যদি ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং কোন ব্যাংকেই যদি সুদী ব্যবস্থা বর্তমান না থাকে তাহলে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়ে যাবে। সুতরাং বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে, কতিপয় ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে সুদ উচ্ছেদ করা সহজতর এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা অধিকতর কঠিন। অর্থনীতি থেকে সুদ অপসারণের সময়সীমা নির্ধারণকালে আমাদের বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে এবং এ উভয় বাস্তবচিত্র সামনে রাখতে হবে। আসুন, এখন আমরা প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ পরীক্ষা করে দেখি।

লাভ-লোকসানে অংশীদারী পদ্ধতি

২০৪. ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার প্রথম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এই ব্যবস্থা নির্ধারিত সুদের হারের পরিবর্তে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্বের ওপর ভিত্তিশীল। ঋণ ভিত্তিক অর্থনীতি কি ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, ইতিপূর্বেই তা আলোচনা করেছি। সুদী ব্যবস্থার এই মারাত্মক পরিণতির কথা উপলব্ধি করেই অনেক অর্থনীতিবিদ,

www.pathagar.com

এমনকি, পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণও ইকুইটি ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করছেন। এখানে আমরা আবার জেমস রর্বাটসনের কথা উদ্ধৃত করছি:

কেন সরকারগুলো অর্থনীতিতে নতুন অর্থ ইস্যু করার এই প্রক্রিয়া (অর্থাৎ ঋণ সৃষ্টি করা) ব্যাংকগুলোর হাতে ন্যস্ত করেছে? এই ক্ষমতা বলে ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের সুদ ভিত্তিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা (সুদ) অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। খোদ সরকারগুলোরই কি উচিত ছিল না নাগরিকদের আয়ের অংশ হিসেবে সরাসরি নিজেদেরই এ অর্থ ইস্যু করা?

গোটা অর্থনীতিতে ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর করার চেয়ে আরও দ্রুত, ব্যাপক ও কঠোরভাবে যদি সুদের ভূমিকা সীমিত করা কাম্য হয় এবং তা যদি সম্ভব করে তোলা যায়, তাহলে কি হবে? তাহলে তা হবে, 'সুদ একটি পাপ' বলে ইসলাম যে শিক্ষা দিয়েছে এবং তারও আগে খৃস্টিয় ধর্ম যা শিখিয়েছিল, তার সাথে পূর্ণ সংগতিশীল। অবশ্য এ লক্ষ্য অর্জনের পথে বাস্তব জটিলতা আছে এবং এ জটিলতা একে অধিকতর দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে; এতদসত্ত্বেও এ লক্ষ্য হাসিলের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি রয়েছে... আজকের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক জীবন যেভাবে ক্রমবর্ধমান ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, এই ব্যবস্থায় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার যে বীজ নিহিত রয়েছে এবং কল্যাণকর উদ্যোগে অংশ নিয়ে ঝুঁকি বহনের মাধ্যমে অর্থ আয় করার পরিবর্তে অর্থ থেকে অর্থ উপার্জনকারীগণ যে প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে[০১] (এসবই এ লক্ষ্যের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি। অনুবাদক)।

২০৫. জন টমলিনসন হচ্ছেন অক্সফোর্ড ভিত্তিক একজন কানাডীয় অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ। উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনীতিতে ঋণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়নের পর তিনি অক্সফোর্ড রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তিনি নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। প্রতিষ্ঠানটি ইকুইটি ইন্সট্রুমেন্টের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার ওপর ব্যাপক গবেষণা করেছে এবং বর্তমানে যেসব ক্ষেত্রে ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু আছে সেসব ক্ষেত্রের জন্য ইকুইটি মার্কেট গড়ে তোলার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এ বিষয়ে তাঁর গবেষণা গ্রন্থের শিরোনাম হচ্ছে "অনেস্ট মানি"। এ গ্রন্থে তিনি ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর করার জন্য বলিষ্ঠ সুপারিশ করেছেন। উপসংহারে তিনি যা লিখেছেন তা নীচে উদ্ধৃত করা হলো। প্রচলিত ব্যবস্থা সংরক্ষণ করার পক্ষে যারা অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন এটি তাদের চিন্তা ও বিবেচনার যোগ্য হবে বলে আশা করা যায়:

ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর অর্থনীতিতে সৃষ্ট যাবতীয় রোগের মহৌষধ নয়। তবে তা অনেক ইতিবাচক ফল দিতে সক্ষম। ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর করলেই তা

www.pathagar.com

আপনা থেকে সুফল বর্ষণ শুরু করবে তা নয় বরং এ থেকে যাতে সুফল লাভ করা যায় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং সেজন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবে রূপান্তর ব্যতীত সুফল পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

রূপান্তরের মাধ্যমে খোদ ব্যাংকিং গোষ্ঠী যে সুফল পাবে তা কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে কেবল তাই নয়; বরং ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের ঝুঁকি থেকেও মুক্ত থাকবে। ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট থেকে দেনা অপসারিত হবে এবং তদস্থলে সুনির্দিষ্ট মূল্যের সম্পদ বা পাওনা প্রতিস্থাপিত হবে; ফলে ব্যাংকের মালিকগণ তাদের শেয়ারের মূল্যের বিপরীতে সমমূল্যের সম্পদের সমর্থন লাভ করবে। একই সাথে প্রত্যেক আমানতকারী (depositor) তার জমাকৃত সকল অর্থ তুলে নিতে পারবে।

ব্যাংকের চলতি হিসাব অথবা চেকিং হিসাবে (সঞ্চয়ী) সেবার চাহিদা হ্রাস পাবে না। দীর্ঘ মেয়াদী আমানতকারীগণ তাদের অর্থ সংরক্ষণ ও হেফাজত করার জন্য ব্যাংককে সার্ভিস চার্জ দিতে বাধ্য হবে; ফলে এ আমানত বিনিময়ের তুলনায় কম আকর্ষণীয় হয়ে পড়বে। সুতরাং ব্যাংক থেকে বাজার, বাজার থেকে ব্যাংক এবং এক হিসাব থেকে আরেক হিসাবে অর্থের আবর্তন গতি (velocity) বৃদ্ধি পাবে। নতুন নতুন ইকুইটি বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রবাহের বিরামহীন গতি সৃষ্টি হবে। সাধারণভাবে বাজারের ক্ষেত্রেও সুফল দেখা দেবে। ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর করার ফলে অর্থের মূল্যে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। সঞ্চিত অর্থ এর মূল্যমান ধরে রাখতে সক্ষম হবে। পণ্যসামগ্রীর দাম কেবল এর যোগান ও চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং পণ্য দামের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বাভাবিক চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত পণ্য-দামের উঠা-নামা পর্যন্ত সীমিত থাকবে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক কর্তৃক নিরূপিত বিনিময় মূল্যের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে তুলনা করা সম্ভব হবে। অর্থের একক আবার বিনিময় মূল্যের ন্যায়সঙ্গত মানদণ্ড বা পরিমাপকে পরিণত হবে। অর্থনীতি হবে একটি যথার্থ বিজ্ঞান।

বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় রূপান্তরিত ব্যবস্থায় তার অধিকাংশই সংশোধিত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন বিনিয়োগকারী যখন তার বিনিয়োগকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য দশ, পনেরো বা বিশ বছর সময় নেয়, তখন স্বাভাবিকভাবে সে বিনিয়োগকে সুস্থ-সাবলিল ও উত্তম (sound) বিনিয়োগ বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এজন্য ব্যাংকগুলো বড়জোড় পাঁচ বছর, এমনকি তিন বছর পর্যন্ত সময় দেয়। বিনিয়োগ ক্ষেত্রে এরূপ স্বল্প মেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বহু উপকারী ও প্রয়োজনীয় কারবার জন্মই নিতে পারে না; তার আগেই বাদ পড়ে যায়। স্থিতিশীল অর্থের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইকুইটি

www.pathagar.com

বিনিয়োগ কর্মসূচির অধীনে প্রয়োজনীয় সিকিউরিটির ওপর আরোপিত যথার্থ গুরুত্ব জনগণকে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করবে; টেকসই ও লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় কারবারের সংখ্যা অধিক হারে সম্প্রসারিত হবে এবং নাটকীয়ভাবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

বর্তমান (existing) সঞ্চয়কারীগণও নিরাপত্তা লাভ করবে। ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর করার ফলে কোন একক (individual) ব্যাংক যেমন বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে, তেমনি রক্ষা পাবে গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাও। সঞ্চয় বন্ধ হবে না; কেবল সঞ্চয়ের প্রকৃতি বদলে যাবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সঞ্চয় হচ্ছে অর্থের এক একটি একক মাত্র; পরিবর্তিত ব্যবস্থায় সঞ্চয় হবে একই সাথে অর্থের একক এবং শেয়ারের একক। অর্থ ও শেয়ার উভয়ের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করতে হবে; কিন্তু এদের মূল্য অবশ্যই বহাল থাকবে। তবে যদি রূপান্তরের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় এবং যদি গোটা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে তাহলে সঞ্চয়ের মূল্য হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ঋণের দাসত্ব থেকেও অনেককেই মুক্ত করবে। জাতি ব্যক্তি উভয়ই তাদের হারানো মর্যাদা আবার ফিরে পাবে। নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে তারা হবে পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সুদ দিলে কিছু লোক কর্মহারা হয়, আর সুদ না দিলে সব লোক বেকার হয়। ম্যানেজারদের সামনে এ দুটি মাত্র পথই খোলা আছে। তাদেরকে এর যে কোন একটি অবশ্যই বাছাই করে নিতে হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত ইকুইটি ব্যবস্থায় ম্যানেজারদের পছন্দ কেবল এই দুই অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে না।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রচলিত ব্যবস্থার ন্যায় ধারাবাহিক (current) অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চক্রের সৃষ্ট যাতনা আর ভোগ করতে হবে না। বিনিয়োগের জন্য নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে অর্থ প্রবাহের ধারা চলতে থাকবে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং কারবারে অর্জিত মুনাফা দ্বারা ক্রমাগতভাবে নতুন নতুন বিনিয়োগ হতে থাকবে। এরা উভয়েই ব্যাংককে দেয় সার্ভিস চার্জ (storage charge) এড়িয়ে চলতে চায় বলে তারা বিনিয়োগের দিকে ধাবিত হবে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রবৃদ্ধি নির্ভর করবে নতুন নতুন ধারণা ও নবতর উৎপাদন ক্ষমতা উদ্ভাবনের ওপর এবং নতুন ঋণ সৃষ্টির ওপর প্রবৃদ্ধির নির্ভরশীলতা আর থাকবে না। নতুন নতুন মুনাফা এবং সঞ্চয়ের ইতিবাচক প্রবাহের ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ভিত্তিশীল হবে।

অর্থের বিশুদ্ধতা ও সততা (integrity) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে মানুষে মানুষে বিরোধের (human conflict) কমপক্ষে একটি কারণ তিরোহিত হবে। সঞ্চয়কারী, নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

আয়কারী ও দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে অর্থ অতি সংগোপনে এবং সবার অলক্ষ্যে যে চুরি করে তার অবসান ঘটবে।

এছাড়া অর্থের সততার ফলে ব্যক্তিগত সততা ও ন্যায় পরায়ণতার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হবে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং স্পষ্টবাদিতার ন্যায় চারিত্রিক বৃত্তিসমূহের চাহিদা বেড়ে যাবে। এসব মহৎ গুণাবলীর ওপরই নির্ভর করবে বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা। ইকুইটি নির্ভরশীলতার মাত্রা ও গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে; এই অবস্থা অভাবী ও বঞ্চিতদের অভাব পূরণে সমাজকে অধিকতর সহানুভূতি ও যত্নশীল করে তুলবে। ফলে গোটা সমাজ পরিণত হবে একটি পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও যত্নশীল সমাজে।

অবশ্য জীবনের গোটা পথই কখনও গোলাপ বিছানো থাকে না। অনেক ভুল-ভ্রান্তি হবে; নতুন পথে যাত্রায় কখনও কখনও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পথ ঢাকাও থাকতে পারে। কারো কারো পক্ষে ঋণভিত্তিক ব্যবস্থায় আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সনাতন ধারায় অভ্যস্ত চিন্তার সূত্র ছিন্ন করাও কঠিন হবে। সন্দেহ নেই, কিছু পাঠক এ ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

নবতর ব্যবস্থায় রূপান্তরের পর বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের প্রকৃত বিনিময় মূল্য যখন স্থিরিকৃত হবে তখন কেউ কেউ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে—এ কথা ঠিক। তবে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব; কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় যে বিপর্যয় ঘটে তা নিয়ন্ত্রণ করা একেবারে অসম্ভব। রূপান্তর প্রক্রিয়ায় যারা অস্বাভাবিক ক্ষতির মধ্যে পড়বে আমাদের উচিত তাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সৎ অর্থের বিষয়টি একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। সৎ অর্থ চোর নয়; সৎ অর্থ মিতব্যয়ীদের কাছ থেকে চুরি করে না; এটা সামাজিকভাবে বিভাজ্য নয়; এবং সৎ অর্থ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চক্রের জন্ম দেয় না; বেকারত্ব সৃষ্টি করে না। অপর দিকে তা মিতব্যয়িতাকে উৎসাহিত করে; টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি ঘটায়; এটা নিজে সৎ এবং সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা এর কাম্য। এসবই হচ্ছে সময়ের দাবী, যথার্থ লক্ষ্য। এসব লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। প্রয়োজন কেবল সদিচ্ছা।"[১০২]

২০৬. টমলিনসন প্রণীত উক্ত গ্রন্থের ওপর মাইকেল রোবোথাম যে মন্তব্য করেছেন তা নীচে উল্লেখ করা হলো :

অর্থ নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি একটি অনন্যসাধারণ মৌলিক অবদান। জন টমলিনসন একজন প্রথিতযশা সাবেক মার্চেন্ট ব্যাংকার; ঋণ ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার উপস্থাপনা অত্যন্ত জোড়ালো ও বলিষ্ঠ। তার পেশকৃত সমাধান অতি উন্নতমানের ও গঠনমূলক। আর্থিক সংস্কার ক্ষেত্রে প্রচলিত সাধারণ মানদণ্ডের

www.pathagar.com

(Parameters) বাইরেও এতে চিন্তা করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে বর্তমানে আমেরিকার নোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১০৩]

২০৭. ফিলিপ মূর ইসলামী ফাইন্যান্স বিষয়ে সম্প্রতি পরিচালিত তার এক গবেষণায় মন্তব্য করেছেন:

সুদ ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে ইকুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের এই দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া যদিও বহুদিক থেকে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ, তবু এ প্রবণতা কেবল ইসলামী দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা ক্রমবর্ধমান হারে সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা থেকে ইকুইটি ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার পুনরুত্থান বিশ্ব অর্থনীতিতে বন্ড ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে ইকুইটি ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় রূপান্তরেরই প্রতিফলন মাত্র- কেউ কেউ বিষয়টিকে এভাবেই দেখছেন।

উদাহরণস্বরূপ, ইটালীর ন্যায় একটি উন্নত অমুসলিম, কিন্তু ঋণের ভারে ন্যুব্জ অর্থনীতির কৌশলের কথা বিবেচনা করুন। ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে সে দেশে বেসরকারীকরণ কর্মসূচি বেগবান হয়ে ওঠে। এই কর্মসূচির শর্তাবলীর অধীনে ইটালীয় আইনে বলা হয়েছে,...

"সরকারি কোম্পানীগুলোকে বেসরকারিকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট তহবিলে (sinking fund) জমা হবে। আইন অনুসারে এ অর্থ শুধু ঋণ পরিশোধেই ব্যবহার করা যাবে এবং সরকারী খাতে ঋণের প্রয়োজনীয়তা (Public Sector Borrowing Requirement) হ্রাস কল্পে তা ব্যয় করা যাবে না। সম্ভবত পশ্চিমা জগৎ আসলে বিগত তিন দশক ধরে নিজের অজ্ঞাতেই ইসলামী আর্থিক নীতিমালার প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে।[১০৪]

২০৮. জনাব আব্বাস মিরাখোর এবং জনাব মোহসিন এইচ খান, তারা দুজনই আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (IMF) গবেষণা বিভাগের অর্থনীতিবিদ। তারা সুদ মুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন। লাভ-লোকসানে অংশীদার পদ্ধতি আলোচনায় তারা নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:

জনাব খান সম্প্রতি রচিত (১৯৮৫) তার এক পেপারে দেখিয়েছেন যে, বিনিয়োগ আমানতের (investment deposits) এই পদ্ধতি ইকুইটি ভিত্তিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রণীত প্রস্তাবনার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বারবার এগুলো উত্থাপিত হয়েছে।[১০৫]

www.pathagar.com

পিটার ওয়ারবার্টন ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি ফিশার, মিনিস্কি, জে, প্রেসলি এবং পি, মিলের তত্ত্বগুলোও আলোচনা করেছেন।[১০৬]

২০৯. এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ইকুইটি ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা কেবল ইসলামী মহলেই করা হয়েছে ব্যাপার আসলে তা নয়; বরং কতিপয় অ-মুসলিম অর্থনীতিবিদও নিখাদ অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন। ঋণ নির্ভর আর্থিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট অবিচার, অস্থিতিশীলতা, বাণিজ্য চক্র ও কারবার আঘাতই তাদেরকে ইকুইটি ভিত্তিক এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে বাধ্য করেছে যা সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বহাল করতে বেশী সক্ষম। প্রচলিত সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানতকারীগণ তাদের আমানতের ওপর সুদ হিসেবে যা পায়, ঋণ নির্ভর অর্থ সম্প্রসারণের ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি তাদের প্রাপ্ত সে সুদের মূল্যকে খেয়ে ফেলে এবং এ বাবদ তাদের প্রকৃত আয় প্রায়শই নেতিবাচক হয়। কিন্তু ইকুইটি ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানতকারীগণ অধিকতর লাভবান হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া ইকুইটি নির্ভর আর্থিক ব্যবস্থা সম্পদ প্রবাহের ধারাকে সাধারণ মানুষের দিকে ঘুরিয়ে দেবে যা প্রকারান্তরে সঞ্চয়কে উৎসাহিত করবে এবং ক্রমশ সুসমন্বিত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

মুশারাকা সম্পর্কে কতিপয় আপত্তি

লোকসানের ঝুঁকি

২১০. যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, মুশারাকা ব্যবস্থায় কারবারে লোকসান দেখিয়ে তা অর্থ যোগানদাতা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার আশংকা রয়েছে। অতঃপর এই লোকসানের ভার আমানতকারীদের ওপরও বর্তাবে। এভাবে আমানতকারীগণ যখন ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হবে তখন তারা তাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখার উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। ফলে তাদের সঞ্চিত সম্পদ তাদের কাছেই অলসভাবে পড়ে থাকবে অথবা ব্যাংকিং খাতের বাইরে অন্য কোন পথে তা লেনদেন করা হবে। আর এর কোনটাই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন অবদান রাখতে সক্ষম হবে না।

২১১. এই যুক্তি বিভ্রান্তিকর। মুশারাকা ভিত্তিতে অর্থ যোগান দেয়ার পূর্বে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ যোগান দেয়ার জন্য প্রস্তাবিত কারবারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখবে। প্রচলিত সুদী ব্যবস্থাতেও দেখা যায় যে, ব্যাংকগুলো সকল আবেদনকারীকেই ঋণ দেয় না। প্রথমেই তারা গ্রাহকের আর্থিক অবস্থা দেখে এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নেয়। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে তারা প্রস্তাবিত কারবারের সুপ্ত সম্ভাবনা

www.pathagar.com

সম্পর্কেও গভীরভাবে পরীক্ষা করে থাকে। অতঃপর যদি দেখা যায় যে, কারবারটি লাভজনক হবে না, তাহলে তারা ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। মুশারাকা কারবারের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আরও ব্যাপক, গভীর এবং অধিকতর সতর্কতার সাথে এসব বিষয়ে স্টাডি করতে হবে। আর এ অতিরিক্ত কাজ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২১২. তাছাড়া কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মুশারাকা বিনিয়োগ কেবল একটি মাত্র কারবারে সীমাবদ্ধ রাখবে না; বরং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বদাই বিভিন্নমুখী বহু ধরনের কারবার ও শিল্পে (Diversified Porofoli of Musharakah) মুশারাকাহ বিনিয়োগ করবে। ধরুন, কোন ব্যাংক যদি অর্থ বিনিয়োগ করার পূর্বেই প্রতিটি বিনিয়োগ প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা স্টাডি করার পর ১০০ গ্রাহকের সাথে ১০০টি কারবারে মুশারাকা ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে, তাহলে এ সবগুলো কারবার একসাথে লোকসানের সম্মুখীন হবে এটা স্বাভাবিক নয়; কিংবা এর বেশীর ভাগ কারবারেই লোকসান হবে তাও ভাবা যায় না। যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যথার্থ সতর্কতা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বড় জোর গুটি কয়েক কারবারে লোকসান হয়ে যেতে পারে। অপরদিকে যেসব মুশারাকা লাভজনক হবে সেসব কারবারে প্রাপ্ত লাভ সুদী ঋণ থেকে লব্ধ আয়ের চেয়ে বেশী হবে বলে আশা করা যায়। আর যেহেতু এই অধিক মুনাফা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাগাভাগি হবে, তাই উভয়ের আয়ই সুদী ব্যবস্থার তুলনায় বেশী হবে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে মুশারাকা বিনিয়োগে লোকসান হবে না এটা ধরে নেয়া যায়; সমগ্র মুশারাকা বিনিয়োগেও লোকসানের আশংকা আছে– এটা কেবল একটা তাত্ত্বিক কথা; এর দ্বারা আমানতকারীদের নিরুৎসাহিত হবার কোন কারণ নেই। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুশারাকা বিনিয়োগ হয় বিভিন্ন খাতে ও বিপুল সংখ্যায়; কিন্তু বর্তমানকালে প্রচলিত যৌথ মূলধনী (Joint Stock Company) কারবারের বিনিয়োগ হয় কোন নির্দিষ্ট খাতে। সুতরাং যৌথ মূলধনী কারবারের তুলনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী ও অসংখ্য মুশারাকা বিনিয়োগে সামগ্রিকভাবে লোকসানের আশংকা খুবই কম। এতদসত্ত্বেও লোকেরা যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার ক্রয় করে। লোকসানের আশংকা থাকা সত্ত্বেও মানুষ এসব কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকে না। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারটি এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তাদের কোন একটি মুশারাকা বিনিয়োগে লোকসান হলে অন্যান্য মুশারাকাহ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা সে লোকসানের ক্ষতিপূরণ করেও লাভ থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের ব্যাংকগুলোর অভিজ্ঞতা এর বাস্তব প্রমাণ। ১৯৯৫ সালের ১লা জুলাই থেকে পাকিস্তানের ব্যাংকগুলো চলতি আমানত ছাড়া বাকী সকল আমানত লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে

www.pathagar.com

গ্রহণ করছে। এমনকি, ব্যাংকগুলো তাদের আমানতকারীদের পুরো আসল ফেরতের গ্যারান্টিও দেয় না। সুতরাং, এখানে ব্যাংকের দেনার দিকটি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে ইকুইটি নির্ভর। এতদসত্ত্বেও আমানতের গতি হ্রাস পায়নি; বরং ইতিপূর্বে আমানত, যেমন করা হতো, এখনও তাই করা হচ্ছে।

১১৩. তাছাড়া ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করতে হবে যাতে সাধারণভাবে সকলে বিশ্বাস করবে যে, অর্থ দ্বারা যে মুনাফা অর্জিত হয় তা মূলত কারবারের ঝুঁকি গ্রহণের পারিতোষিক। দক্ষতা দ্বারা এবং কারবারকে বহুমুখী করার মাধ্যমে এ ঝুঁকি নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা যেতে পারে; কিন্তু একে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। কেউ মুনাফা অর্জন করতে চাইলে তাকে এ নিম্নতম ঝুঁকি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রে এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে লোকসানের মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের অর্থ বিপন্ন হওয়ার আশংকা আছে বলে কখনও কেউ আপত্তি উত্থাপন করেনি। বস্তুত ব্যাংকিং ও অর্থায়ন কার্যক্রমকে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কার্যাবলী থেকে পৃথক করার ব্যবস্থা করেই সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে। জনগণকে এ কথা মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবল অর্থ ও দলিল-পত্রাদির কারবার করে এবং শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্জিত প্রকৃত ফলাফলের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই; এ ব্যাপারে তাদের কিছু করণীয় নেই। এই সূত্রের (premise) ভিত্তিতেই যুক্তি দেওয়া হয় যে, প্রকৃত কারবারে লাভ-লোকসান যাই হোক, সকল অবস্থাতেই ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয় হবে নির্ধারিত-তারা নির্ধারিত আয় পাবার অধিকারী। আর্থিক খাতকে শিল্প ও বাণিজ্য খাত থেকে এভাবে পৃথক করার ফলে তা সামষ্টিক অর্থনীতি পর্যায়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। অবশ্য, আমরা যখন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কথা বলি, তখন এর দ্বারা আমরা এমন কোন ব্যবস্থাকে বুঝি না যা প্রত্যেক কাজে হুবহু প্রচলিত ব্যবস্থার অনুসরণ করে চলবে। ইসলামের নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে; ইসলামী নীতিমালা ও মূল্যবোধ আর্থিক ব্যবস্থাকে শিল্প ও বাণিজ্য থেকে আলাদা করায় বিশ্বাসী নয়। মানুষ যদি ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থাকে একবার বুঝে উঠতে পারে, তাহলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যৌথ মূলধনী কারবারের চেয়ে আর্থিক খাতে অধিক বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে।

অসততার যুক্তি প্রসঙ্গে

২১৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুশারাকাহ বিনিয়োগের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি হচ্ছে অসততা সম্পর্কিত। অসৎগ্রাহকরা মুশারাকাহ পদ্ধতির সুযোগের অসৎ ব্যবহার করতে পারে এবং অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে লাভের অংশ প্রদান এড়িয়ে যাওয়ার

www.pathagar.com

আশংকা দেখা দিতে পারে। এসব অসৎ গ্রাহক অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে দেখাতে পারে যে, কারবারে কোন মুনাফা অর্জিত হয়নি এবং এভাবে অর্থায়নকারীকে তার পাওনা লাভ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এমনকি, এরা কারবারে লোকসান হয়েছে বলেও দাবী করতে পারে; আর এরূপ অবস্থায় লাভের অংশ পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না বরং পুরো আসলও ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হবে।

২১৫. এ আশঙ্কা যথার্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে, গোটা সমাজ যেখানে দুর্নীতির ব্যাধিতে সংক্রামিত হয়ে আছে-এবং দুর্নীতি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, সেখানে এ আশংকা আরও অধিক। এটি নিঃসন্দেহে একটি সমস্যা। তবে এ সমস্যার সমাধান তত দুরূহ নয় যতটা দুরূহ বলে একে মনে করা হয় বা অতিরঞ্জিত করা হয়।

২১৬. দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গোটা আর্থিক ব্যবস্থা যদি খাঁটি ইসলামী ধারায় ও পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং এর পেছনে যদি সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সযত্ন সমর্থন থাকে, তাহলে অসততার এ সমস্যা উত্তরণ কঠিন হবে না। প্রথমত, যথার্থ অর্থে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে ক্রেডিট রেটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। প্রত্যেক কোম্পানী বা সংস্থা যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ক্রেডিট রেটিং করাতে আইনত বাধ্য হয় সে জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও জারী করতে হবে। এমনকি, কোন বৃহৎ ফার্ম যখন নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত অর্থ যোগান দেওয়ার প্রস্তাব করবে, তখন তাকেও একই নিয়মের আওতায় ক্রেডিট রেটিং করাতে বাধ্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত, একটি সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত নিরীক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে সকল গ্রাহকের কারবারের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সমসাময়িক কালের কতিপয় স্কলার এ পরামর্শও দিয়েছেন যে, কেবল মোট উদ্বৃত্তের (Gross Margin) ভিত্তিতে মুনাফা হিসাব নিরূপণ (calculate) করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় মতবিরোধ (disputes) কম হবে এবং অপব্যবহার ও তসরুপ হ্রাস করা সম্ভব হবে। এরপরও যদি কোন গ্রাহকের মধ্যে অসদাচরণ (misconduct) অসততা অথবা অবহেলা পাওয়া যায় এবং তা যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে এমন গ্রাহকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এ ধরনের গ্রাহক যাতে দেশের কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কমপক্ষে, কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে হলেও এ ব্যবস্থা নিতেই হবে।

২১৭. উপরোল্লেখিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ প্রকৃত মুনাফা গোপন করা বা অন্য যে কোন ধরনের অসদাচরণের পথে শক্তিশালী প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া ব্যাংকের গ্রাহকগণ ক্রমাগতভাবে কৃত্রিম লোকসান

www.pathagar.com

দেখাতে পারবে না; কারণ বহু দিক দিয়ে তা তাদের নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। একথা সত্য যে, উল্লিখিত সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্ত অসৎ গ্রাহকরা তাদের নীতি বিবর্জিত অপকর্ম করতে সফলকাম হতে পারে; তবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ফলে এবং সাধারণভাবে প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নত পরিবেশে এরূপ ঘটনার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। [সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিতেও ঋণ খেলাপী গ্রাহকগণ সর্বদাই কু-ঋণজনিত সমস্যা সৃষ্টি করছে। সুতরাং একে মুশারাকাহ পদ্ধতি প্রত্যাখান করার যুক্তি (justification) বা ওজর বানানো উচিত নয়]।

মুরাবাহা পদ্ধতি প্রসঙ্গে

২১৮. তদুপরি ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম কেবল লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারী ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত নয়। এ কথা ঠিক যে, মুশারাকা হচ্ছে একটি আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতি; এ পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার সাথে পূর্ণ সংগতিশীল, কেবল তাই নয়, বরং ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দর্শনের সাথেও এর পূর্ণ মিল রয়েছে। তবু ইসলামী ব্যাংকের সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মুরাবাহ, ইজারাহ, সালাম, ইসতিসনা ইত্যাদি আরও বেশ কিছু ইন্সট্রুমেন্ট বা পদ্ধতি আছে। এ সব বিনিয়োগ পদ্ধতির কোন কোনটিতে ঝুঁকিও অপেক্ষাকৃত কম। যেসব ক্ষেত্রে মুশারাকাহ বিনিয়োগ অস্বাভাবিক ঝুঁকিপূর্ণ অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে মুশারাকাহ পদ্ধতি প্রয়োগ করা আদৌ সম্ভব নয় বা উপযোগী হয় না সেসব ক্ষেত্রে উল্লেখিত কম ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন কোন আপীলকারী অভিযোগ করেছেন যে, ফেডারেল শরীয়াহ কোর্ট তাদের প্রদত্ত রায়ে মার্ক-আপ পদ্ধতিকেও ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থি বলে ঘোষণা করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ত অনুসারে একটি বৈধ বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে মুরাবাহা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে না।

২১৯. আসলে ফেডারেল শরীয়া কোর্টের বক্তব্য ভুল বুঝার কারণেই এ অভিযোগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ফেডারেল শরীয়াহ কোর্ট নীতিগতভাবে মুরাবাহা পদ্ধতিকে অসিদ্ধ বলেছেন, ব্যাপার তা নয়; তারা বরং তাদের রায়ের ৩৬৭ প্যারায় আমদানি ক্ষেত্রে মুরাবাহা পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে আদালত বর্তমানে পাকিস্তানে প্রচলিত মার্ক-আপ পদ্ধতিকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাকে ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থি বলে ঘোষণা করেছেন। রায়ে তারা আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, এ পদ্ধতিকে অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং শরীয়তের অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী উপেক্ষা করে নির্বিচারে ব্যাপকভাবে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে প্রচলিত সুদী ব্যবস্থার সাথে এ মার্ক-আপ পদ্ধতির তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

www.pathagar.com

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, পাকিস্তানে যেভাবে মার্কআপ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তা আদৌ কোন মুরাবাহা পদ্ধতি নয়, এটা কেবল নামের বদল ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবে অভিপ্রেত মানে ক্রয়-বিক্রয় কখনই করা হচ্ছে না। ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত আবশ্যকীয় শর্তাবলীসহ মুরাবাহা পদ্ধতি কার্যকর করা হলে শরীয়ত মোতাবেক তা নিষিদ্ধ নয়। ফেডারেল শরীয়া কোর্টও এ ঘোষণা দেয়নি যে, মূলত অন্তর্নিহিত ত্রুটির কারণে মুরাবাহা পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল-কুরআন নাযিলকালে সুদের নিষেধাজ্ঞা অস্বীকারকারীরা এই বলে আপত্তি করত যে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই'। তাদের এই আপত্তির পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে (অত্র রায়ের ৫০ ও ৫১ প্যারা) আমরা উল্লেখ করেছি যে, এরা কোন পণ্য বাকীতে বিক্রয়কালে নগদ দামের চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করত। তাদের আপত্তি এখানে ছিল যে, প্রথম বিক্রয় কালে বেশী দাম ধার্য করা হলে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি; কিন্তু পরবর্তীতে ক্রেতা যদি নির্ধারিত সময়ে দাম পরিশোধে ব্যর্থ হয়, আর বিক্রেতা যদি পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় এবং সে জন্য পূর্বনির্ধারিত পাওনা দামের ওপর কোন অতিরিক্ত ধার্য করে, তাহলে এই বৃদ্ধিকে বলা হয় 'রিবা'; আর তা হয় নিষিদ্ধ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এই বলে তাদের এ আপত্তির জবাব দিয়েছে যে, *আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন, আর 'রিবা'কে করেছেন হারাম।* অত্র রায়ের ১৯০ প্যারায় ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, মূলত মুরাবাহা হচ্ছে একটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার যাবতীয় মৌলিক শর্ত অবশ্যই পরিপালন করতে হবে। মুরাবাহা কেবল সে সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে যেখানে গ্রাহক প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকের কাছে থেকে মাল ক্রয় করতে চাইবে। আর ব্যাংককে গ্রাহকের প্রার্থীত মাল আসল বিক্রেতার কাছ থেকে অবশ্যই ক্রয় করতে হবে এবং মালের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল (ফিজিক্যাল বা কন্সট্রাকটিভ) প্রতিষ্ঠিত করার পর গ্রাহকের কাছে তা বিক্রি করতে হবে। মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ে এসব যাবতীয় উপাদান দৃশ্যত উপস্থিত থাকতে হবে এবং এর সকল আইনগত ও যৌক্তিক পরিণতি, বিশেষ করে, মাল ব্যাংকের মালিকানা ও দখলে থাকাকালে এর সকল প্রকার ঝুঁকি ব্যাংককেই বহন করতে হবে। এগুলো হচ্ছে মুরাবাহার মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা সুদ ভিত্তিক অর্থায়ন থেকে মুরাবাহাকে আলাদা হিসেবে প্রতিপাদন করেছে। এই শর্তাবলী অস্বীকার বা উপেক্ষা করলে, যদিও তা সহজ করার লক্ষ্যে হয়, গোটা লেনদেন সুদভিত্তিক নিষিদ্ধ লেনদেনে পর্যবসিত হয়।

২২০. ইসলামী ব্যাংকের মুরাবাহা বিনিয়োগের ব্যাপারে প্রায়শ এই আপত্তি করা হয় যে, এই পদ্ধতিতে বাকীতে মাল বিক্রয়কালে মালের দাম বেশী ধার্য করা হয়; অর্থাৎ একই পণ্য নগদ বিক্রি হলে এর যে দাম হয় বাকীতে তার চেয়ে উচ্চতর দাম

www.pathagar.com

নেওয়া হয়। যেহেতু ক্রেতাকে দাম পরিশোধের জন্য সময় দেওয়ার কারণেই এই বাড়তি দাম নেওয়া হয়, সেহেতু তা সুদ ভিত্তিক ঋণের মতই হয়ে যায়।

২২১. ইতিপূর্বে এই রায়ের ১৩৬ থেকে ১৪০ প্যারায় এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে, ইসলাম অর্থ ও পণ্যকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছে। অর্থ ও পণ্য উভয়েরই পৃথক পৃথক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলাম উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা নিয়ম-কানুন (Rules) ও নীতিমালা প্রদান করেছে। অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগ (Utility) নেই; বরং অর্থ বিনিময়ের একটি মাধ্যম; এছাড়া আর কোন গুণ অর্থের নেই। তাই কোন এক একক অর্থের (মুদ্রা) সাথে একই জাতের অর্থের (মুদ্রার) বিনিময় করতে হলে উভয়ের মূল্য সমান সমান হতে হবে। যদি পাকিস্তানী ১০০০/- রুপীর একটি নোটের সাথে একই দেশের অন্য নোটের বিনিময় করতে হয়, তাহলে অন্য নোটগুলোর মূল্য অবশ্যই ১০০০/- রুপীর সমান হতে হবে। এখানে রুপীর মূল্যে প্রথম ১০০০/- রুপী নোটটির দাম যেমন বৃদ্ধি করা যাবে না, তেমনি এর দাম হ্রাস করাও যাবে না, এমনকি তাৎক্ষণিক হাতে হাতে বিনিময় কালেও নয়। কারেন্সি নোটের নিজস্ব কোন উপযোগিতা যেমন নেই, তেমনি এর ভিন্নতর কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যও (আইনের দ্বারা স্বীকৃত) নেই। সুতরাং একই জাতের অর্থ বিনিময়কালে কোন পক্ষ যদি বেশী দেয়, তাহলে সেই অতিরিক্ত অংশ দেওয়া হবে বিনিময় ছাড়া বা মাগনা। আর ইসলামী শরীয়তে এরূপ মাগনা লেনদেনের অনুমতি নেই। একই মুদ্রা উপস্থিত হাতে হাতে বিনিময় করতে হলে উভয় পক্ষের মূল্য সমান সমান হওয়ার এ বিধান (Rule) যেমন প্রযোজ্য, তেমনি ঋণের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। ঋণের ক্ষেত্রে আসলে একই জাতের মুদ্রা (অর্থ) বিনিময় করা হয়। লেনদেনের মাঝখানে সময়ের একটা ব্যবধান থাকে মাত্র। সুতরাং এক্ষেত্রে ঋণদাতা যদি কোন অতিরিক্ত দাবী করে তাহলে সময় ছাড়া এই অতিরিক্তের আর কোন বিনিময় দেওয়া হয় না।

২২২. কিন্তু স্বাভাবিক পণ্যসামগ্রীর ব্যাপার ভিন্নতর। দ্রব্যসামগ্রীর নিজস্ব উপযোগ আছে, আর আছে বিভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্য। মালিকের স্বাধীনতা আছে সে তার ইচ্ছামত যে কোন দামে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে, অবশ্য যদি সে দাম পণ্যের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিক্রেতা যদি প্রতারণা ও জুয়াচুরির আশ্রয় না নেয় অথবা আত্মসাৎ না করে তাহলে ক্রেতা রাজী থাকলে সে বাজার দামের চেয়ে বেশী দামে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতা যদি বিক্রেতা কর্তৃক ধার্যকৃত বেশী দামে পণ্যটি কিনতে সম্মত হয় তাহলে এই বাড়তি দাম গ্রহণ করা বিক্রেতার জন্য বৈধ। এভাবে বিক্রেতা নগদে বিক্রয়কালে যেমন বাজার দামের চেয়ে বেশী দাম নিতে পারে তেমনি বাকীতে বিক্রি করার সময়েও বাড়তি দাম ধার্য করতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

বিক্রেতাকে অবশ্যই এ শর্ত পূরণ করতে হবে যে, সে ক্রেতার সাথে ধোকা বা ঠগবাজী করবে না এবং তাকে পণ্য ক্রয়ে কোন ভাবেই বাধ্য করবে না। অপরদিকে ক্রেতাকেও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় সম্মত হওয়ার শর্ত পূরণ করতে হবে।

২২৩. কখনও কখনও বলা হয় যে, নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বাড়তি দাম নেওয়া হলে তা দাম পরিশোধ বিলম্বিত করা বা সময়ের কারণে নেওয়া হয় না; এজন্য তা বৈধ। কিন্তু বাকী বিক্রয়ের দাম বেশী নিলে সে বেশীটুকু দাম পরিশোধ বিলম্বিত করা তথা সময়ের বিপরীতে নেওয়া হয়, এজন্য তা হয় সুদের সমতুল্য। এই যুক্তিতে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দাম পরিশোধের মেয়াদকে বিবেচনায় রেখে পণ্যের দাম বাড়ানো হলে সে লেনদেন সুদের সংজ্ঞার আওতায় এসে যায়। কিন্তু এটি আসলে একটি ভুল ধারণা। এই অনুমিতি সঠিক নয়। বিলম্বে দাম পরিশোধের কারণে অতিরিক্ত দাম ধার্য করা হলে দামের বাড়তি অংশ সুদ হয় কেবল তখন, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বিনিময়ের বিষয়বস্তু হয় একই জাতের মুদ্রা বা অর্থ। অন্যথায় অর্থের বিনিময়ে কোন পণ্য বিক্রি করা হলে সে পণ্যের দাম নির্ধারণের সময় বিক্রেতা অনেক বিষয় বিবেচনা করে যার মধ্যে দাম পরিশোধের সময়ও একটা বিবেচ্য বিষয় হিসেবে থাকে। বস্তুত বিক্রেতা যে পণ্য বিক্রি করতে চায় সে পণ্যের নিজস্ব উপযোগ আছে; বিক্রেতা বিভিন্ন কারণে এর দাম বেশী চাইতে পারে। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন কারণে ক্রেতা উক্ত চড়া দাম দিয়ে পণ্যটি ক্রয় করতে রাজি হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রেতার বিবেচ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ হতে পারে:

ক. বিক্রেতার দোকান ক্রেতার নিকটবর্তী এবং ক্রেতা এর চেয়ে দূরে অবস্থিত বাজারে যেতে চায় না;

খ. অন্যান্য বিক্রেতার চেয়ে এই বিক্রেতা অধিক বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন; বিক্রেতার ওপর ক্রেতার আস্থা আছে যে, সে তাকে তার কাঙ্ক্ষিত ও ভালো মানের জিনিস দেবে;

গ. বহু ক্রেতার ভীড়েও বিক্রেতা তাকে যথার্থ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করবে;

ঘ. অন্যান্য দোকানের চেয়ে এই বিক্রেতার দোকান বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আরামপ্রদ;

ঙ. অন্যদের তুলনায় সেই বিক্রেতা অধিক ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী।

২২৪. এসব বিষয় এবং অনুরূপ আরও বহু বিবেচ্য বিষয় গ্রাহকের কাছে উচ্চ দাম ধার্য করায় ভূমিকা পালন করে। একইভাবে যদি তার পণ্যের দাম এজন্য বৃদ্ধি করে যে, সে তার গ্রাহককে বাকীতে মাল দিচ্ছে তাহলে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে এ উচ্চতর

www.pathagar.com

দাম অবৈধ নয়। যদি না এতে কোন ধোকা, প্রতারণা বা ঠগবাজী থাকে এবং ক্রেতা যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সে দাম দিতে সম্মত হয়। কারণ পণ্যের দাম বৃদ্ধি করার কারণ যাই হোক, গোটা দাম নির্ধারিত হয়েছে পণ্যের বিপরীতে, অর্থের বিপরীতে ধার্য হয়নি। এ কথা ঠিক যে দাম চাওয়া এবং দাম নির্ধারণ করার সময় বিক্রেতা দাম পরিশোধের জন্য প্রদত্ত মেয়াদের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রেখেছে; কিন্তু যখনই দাম নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন নির্ধারিত দামের সম্পর্ক হয় পণ্যের সাথে, সময়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকে না এবং এ নির্ধারিত দাম সর্বদা একই থাকে। বিক্রেতা কখনও সে দাম আর বাড়াতে পারে না। এ দাম যদি সময়ের বিপরীতে নির্ধারিত হত, তাহলে মেয়াদ শেষে আরও সময় বাড়িয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিক্রেতা এ দাম বৃদ্ধি করতে পারত।

২২৫. বিষয়টি আরও এক দিক থেকে উপস্থাপন করা যায়। ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, অর্থের সাথে অর্থের বিনিময় কেবল সমান সমান মূল্যের ভিত্তিতেই করা যায় এবং এক্ষেত্রে ঋণ লেনদেনে (অর্থের বিনিময়ে অর্থ) কোন অতিরিক্ত দাবী করা হলে এই অতিরিক্তের কোন বিনিময় দেওয়া হয় না; তবে দাম পরিশোধের জন্য কেবল সময় দেওয়া; আর এই সময়কেই বলা হয় অতিরিক্তের বিনিময়। এ কারণেই ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ঋণদাতা পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় এবং বর্ধিত মেয়াদের বিনিময়ে তার পাওনার পরিমাণও বৃদ্ধি করে থাকে।

২২৬. উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ এই দাঁড়ালো যে, অর্থের বদলে অর্থ বিনিময় করা হলে তার ওপর কোন অতিরিক্ত লেনদেন করা বৈধ নয়; এরূপ বিনিময় নগদ হোক বা ঋণ হোক। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে যখন কোন পণ্যসামগ্রী বিক্রি করা হয়, তখন ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় এবং এ দাম বাজার দরের চেয়ে বেশীও হতে পারে; বিক্রি নগদে হলে এরূপ হতে পারে; আর বাকীতে হলেও তা হতে পারে। বাকীতে বিক্রি হলে বাকী দাম পরিশোধের জন্য যে সময় দেওয়া হয়, সে মেয়াদ পণ্যের অতিরিক্ত দাম নির্ধারণে অন্যতম আনুষঙ্গিক একটি কারণ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু অর্থের পরিবর্তে অর্থ বিনিময়ে প্রদত্ত মেয়াদকে যেমন গোটা অতিরিক্ত অংশ ধার্যের একমাত্র কারণ ও ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় অর্থের দ্বারা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে তেমন হয় না।

২২৭. ইসলামী ফিকাহর চার মাযহাবই সর্বসম্মতভাবে এ রায় দিয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম ফকিগণও এর সাথে সম্পূর্ণ একমত। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে মুরাবাহা লেনদেনের বিশুদ্ধ শরয়ী অবস্থান। তবে এ ব্যাপারে নিম্নে উল্লেখিত দুটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে:

www.pathagar.com

ক. মনে রাখতে হবে ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থায়নে মুরাবাহা পদ্ধতির ব্যবহার ও সুদ ভিত্তিক ঋণের অবস্থান অতি নিকটবর্তী; উভয়ের মধ্যে পার্থক্যসূচক সীমারেখাটি অতি সূক্ষ্ম; এই সীমারেখা রক্ষা করতে হলে ইতিপূর্বে উল্লেখিত মুরাবাহার শর্তাবলী পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। এসব শর্তের কোন একটি শর্তকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা হলে তা মুরাবাহাকে সুদী লেনদেনে পর্যবসিত করবে। সুতরাং যথাযথ যত্ন ও সতর্কতার সাথে মুরাবাহা পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

খ. ইসলামী শরীয়ত অনুসারে মুরাবাহা নিঃসন্দেহে একটি বৈধ পদ্ধতি। এর বৈধতাকে যথাস্থানে রেখেই এ কথা বলা যায় যে, এ পদ্ধতি অপপ্রয়োগ ও অপ-ব্যবহারের শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাছাড়া এ কথা না বলে উপায় নেই যে, ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক দর্শনের আলোকে এ পদ্ধতিটি ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে যথার্থ উপযোগী ও আদর্শ পদ্ধতি নয়। সুতরাং এ পদ্ধতির ব্যবহার কেবল সেসব ক্ষেত্রেই হওয়া বাঞ্ছনীয় যেখানে মুশারাকাহ ও মুদারাবা পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা সম্ভব নয় বা আদৌ প্রযোজ্য নয়।

২২৮. মুশারাকা ও মুদারাবা ছাড়াও ইজারা (ভাড়া), সালাম ও ইসতিসনা ইত্যাদি শরীয়াহসম্মত বেশ কয়টি পদ্ধতি আছে। বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি না। অর্থনীতি থেকে সুদের অপসারণ কল্পে সরকারের কাছে দাখিলকৃত বিভিন্ন রিপোর্টে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দাখিল করেছে কাউন্সিল অব ইসলামিক ইডিওলজি ১৯৮০ সালে। দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করেছে শরীয়াহ এ্যাক্ট এর আওতায় গঠিত দি কমিশন ফর ইসলামাইজেশন অব ইকোনমি। কমিশন তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন ১৯৯১ সালে। অবেশেষে রাজা জাফরুল হককে চেয়ারম্যান করে কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে কমিশন তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। এসব কয়টি রিপোর্ট আমরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। এসব রিপোর্টে উপস্থাপিত প্রস্তাবনার খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ে মন্তব্য না করে সামগ্রিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ করে আমরা বলতে চাই যে, এসব রিপোর্ট প্রণয়নের মাধ্যমে অন্তত মৌলিক পটভূমি তৈরি করা হয়েছে যেখান থেকে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।

২২৯. উক্ত আলোচনার মূল কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে, অপরিহার্য আবশ্যকতার তত্ত্ব চলমান সুদী ব্যবস্থা চিরকাল অথবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বহাল রাখার ওজর হতে পারে না। তবে একটি সুদমুক্ত ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থায় উত্তরণে যে সময়ের প্রয়োজন

www.pathagar.com

হবে নেহায়েত এতটুকু সময় মঞ্জুর করার জন্য এ তত্ত্বের সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সরকারী ঋণ প্রসঙ্গে

২৩০. সুদ অপসারণের পথে সরকারী ঋণ একটি বড় সমস্যা বলে অনুভূত হয়। পাকিস্তান সরকারের ওপর বর্তমানে দেশের ভেতর ও বহির্বিশ্বের ঋণ দাতাদের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের দুর্বহ এক বোঝা চেপে আছে। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণকে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিতে রূপান্তরের বিষয়টি উপরোল্লেখিত সব কয়টি রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামাবাদে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. ওয়াক্বার মাসুদ খান এই মোকদ্দমার জুরিস কনসাল্ট হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এ সমস্যার গুরুত্ব এবং এক্ষেত্র থেকে সুদ বিলুপ্ত করার বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আদালতে তিনি একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছেন। এ বিবৃতির ২৯ থেকে ৪৯ পৃষ্ঠাব্যাপী তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি যে বিকল্প সমাধানের পরামর্শ রেখেছেন তার সার কথা হচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারের যাবতীয় ঋণকে প্রকল্প-সংযুক্ত (project related) বিনিয়োগে বা অর্থায়নে রূপান্তর (design) করতে হবে। এই ব্যবস্থা একদিকে এ বিনিয়োগগুলোকে শরয়ী বিধান ও নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ বানাবে; অপরদিকে একই সাথে এক্ষেত্রে ধার করা অর্থ নিয়ে যে দুর্নীতি ও আত্মসাতের জোয়ার বয়ে চলেছে তা কমিয়ে আনতেও সহায়ক হবে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করার পর এ বিষয়ে আমাদের অভিমত হচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে সুদকে অত্যাবশ্যকীয় ধরে নিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য একে চলতে দেয়া যায় না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, বেসরকারী ব্যাংকিং লেনদেনকে সুদমুক্ত পদ্ধতিতে রূপান্তরে যে সময় দরকার, এক্ষেত্রে তার চেয়ে কিছু বেশী সময় লাগতে পারে।

বৈদেশিক ঋণ প্রসঙ্গে

২৩১. এই মামলায় সুদ সংক্রান্ত যেসব আইনের ধৈবতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে সে আইনগুলোর সাথে বৈদেশিক ঋণের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। তবে সুদকে যদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তাহলে সেই নিষেধাজ্ঞার আঘাত কোন না কোন দিক দিয়ে অবশ্যই বৈদেশিক ঋণ লেনদেনের ওপরে গিয়েও পড়বে। বস্তুত বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রটি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে সুদের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা সবচেয়ে জটিল ও কঠিন। ১৯৯৯ সালে ১মার্চ পাকিস্তান সরকারের সর্বমোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমান আন্তঃব্যাংক বিনিময় হার অনুসারে দেশীয় মুদ্রায় এ ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৬১০ বিলিয়ন রুপিজ। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে,

www.pathagar.com

এ ধরনের ঋণকে সুদ মুক্ত পদ্ধতিতে রূপান্তর করা প্রায় অসম্ভব।

২৩২. উল্লিখিত সমস্যার ইসলামী সমাধান সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের বৈদেশিক ঋণ যে গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বিষয়টি গভীর বিবেচনার দাবী রাখে। শুরুতে আমরা কেবল আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনেই আন্তর্জাতিক উৎসসমূহের কাছে ঋণের জন্য হাত বাড়াতে আরম্ভ করেছিলাম। পরবর্তী পর্যায়ে এসে আমরা অনুন্নয়নশীল খাতে ব্যয়ের জন্যেও বিদেশী ঋণের আশ্রয় নিতে লাগলাম। তারও পরে এসে আমরা পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধের জন্য বিপুল পরিমাণের ঋণ গ্রহণ করতে থাকলাম; আর সর্বশেষে এখন আমরা বিদেশী ঋণদাতাদের কেবল পাওনা সুদ পরিশোধের জন্যই বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা মাথায় তুলে নিচ্ছি।

২৩৩. অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ না হয়েও পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে, প্রতিনিয়ত আমরা গোটা জাতিকে বিদেশী ঋণদাতাদের দাসত্বের অধীনে ঠেলে দিচ্ছি। প্রতি বছর আমরা বড় বড় অংকের ঋণ করছি; আর এভাবে আমাদের বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের অনাগত ভবিষ্যৎ ঋণের কাছে বাঁধা (Mortgage) রাখছি। ধারণা করা হয় যে, বৈদেশিক ঋণ উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহৃত হয় এবং এসব দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের ক্ষেত্রে এ ধারণা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এ সত্য আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। সুসান জর্জ একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদ; তিনি এখন ফ্রান্সে বসবাস করছেন। উন্নয়ন ও বিশ্ব সমস্যার ওপর তিনি ব্যাপক লেখালেখি করেছেন। আমস্টারডামের ট্রান্সন্যাশনাল ইন্সটিটিউটের তিনি একজন এসোসিয়েট ডাইরেক্টর। তৃতীয় বিশ্বের ঋণের ওপর প্রণীত তার গ্রন্থগুলো বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে; তার কয়েকটি পুস্তক আন্তর্জাতিক পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের ঋণের ফলাফলের ব্যাপারে তিনি পৃথিবীবাসীর চোখ খুলে দিয়েছেন। এই ফলাফলের সংক্ষিপ্ত যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তা তুলে ধরা হলো:

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD)-র মতে ১৯৮২ হতে ১৯৯০ সময়কালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতি মোট সম্পদ প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৯২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই সম্পদের মধ্যে ছিল ওইসিডি-এর বিভিন্ন শ্রেণীর অফিসিয়াল উন্নয়ন ফাইন্যান্স, রপ্তানি ঋণ ও বেসরকারী অর্থ প্রবাহ; অন্য কথায় যাবতীয় অফিসিয়াল দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় (bilateral and multilateral) সাহায্য, বেসরকারী দাতব্য অনুদান, বাণিজ্যিক ঋণ ও সরাসরি

www.pathagar.com

বেসরকারী বিনিয়োগ এবং ব্যাংক ঋণ। এই সম্পদের বেশীর ভাগই ছিল নতুন ঋণ, সাহায্য বা অনুদান নয়; স্বাভাবিকভাবেই এ ঋণের ওপর ভবিষ্যতে লভ্যাংশ (dividend) বা সুদ পাওনা হবে।

১৯৮২-৯০-এর একই সময়ে উনয়নশীল দেশসমূহ কেবল ঋণ পরিশোধ বাবদ (আসল ও সুদ) ঋণদাতা দেশগুলোকে ফেরত দিয়েছে ১৩৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সম্পদ প্রবাহের প্রকৃত চিত্র (true picture) পেতে হলে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত আরও অনেক কিছু যোগ করতে হবে। যেমন, রয়ালটি, লভ্যাংশ, প্রত্যাবর্তিত মুনাফা (repatriated profit), কাঁচামালের জন্য যথোচিত দামের পরিবর্তে কম দাম দেওয়া ইত্যাদি অনুরূপ আরও অনেক বিষয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রদত্ত সম্পদ ১৩৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তাদের প্রাপ্ত সম্পদ ৯২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে বিত্তশালী দেশসমূহের অনুকূলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হচ্ছে ৪১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তুলনা করার জন্য, যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল প্ল্যান ১৯৪৮ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপে হস্তান্তর করেছে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯৯১ সালে ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এভাবে ১৯৮২-৯০ এর আট বছরে দরিদ্র দেশগুলো কেবল তাদের ঋণ পরিশোধের (debt servicing) মাধ্যমে ধনীদের জন্য ছয়টি মার্শাল প্ল্যানে অর্থ যোগান দিয়েছে।

এই অস্বাভাবিক (extraordinary) অধিক পরিমাণ অর্থ ফেরত প্রদান সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট ঋণের বোঝা কি বিন্দু মাত্রও হ্রাস পেয়েছে? দুর্ভাগ্য যে তা হয়নি। ১৯৮২-৯০ সময়কালে নিয়মিত কিস্তি প্রদান (amortization) সহ মোট ঋণ পরিশোধ বাবদ ১.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক পরিশোধ করা হয়। এতদসত্ত্বেও ঋণগ্রহীতা দেশগুলো ১৯৮২ সালের তুলনায় শতকরা পূর্ণ ৬১ ভাগ অধিক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ১৯৯০ দশকের যাত্রা শুরু করেছে। এ সময় সাব-সাহারান আফ্রিকার ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ১১৩%; আর অতি দরিদ্র, তথাকথিত এলএলডিসি বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১১০ ভাগ।[১০৭]

নিরপেক্ষ অনেক লেখকের অভিমত হচ্ছে যে, তৃতীয় বিশ্বের ঋণের বিষয়টি কেবল আর্থিক বিষয় নয়; বরং এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও বিশ্ব ব্যাংকের (WB) ঋণ সর্বদাই কঠোর শর্ত সম্বলিত হয়ে থাকে। 'প্রকল্প সহায়তা' (Program aid) ঋণের ক্ষেত্রে যদিও ঋণগ্রহীতা দেশকে ঋণের অর্থ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করার নিশ্চয়তা বিধান করার লক্ষ্যে আরোপিত কতিপয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যয় কর্মসূচি গ্রহণের শর্তে (Package) সম্মত হতে হয়, তবু প্রকল্প

www.pathagar.com

যখন ব্যর্থ হয় এবং ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন প্রকল্প সহায়তা 'ঋণকে কাঠামোগত সংস্কার'(Structural Adjustment) ঋণে রূপান্তর করা হয়। আর এতে ঋণ-বদ্ধ দেশের গোটা অর্থনীতি তদারক করার শর্ত আরোপ করা আছে। এভাবে ঋণদাতাগণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকারের বৈধতা প্রতিপাদন করে নিয়েছে। এতদসত্ত্বেও এসব নীতিমালা ও কর্মসূচী যখন ঋণের গতি পরিবর্তনে ব্যর্থ হয় তখন 'কৃচ্ছতা কর্মসূচি'র (Ousterity Programs) আশ্রয় নেয়া হয় এবং সমাজ সেবা, সমাজ কল্যাণ ও শিক্ষাখাতের ব্যয়কে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে দেওয়া হয়। সুসান জর্জ এবং ফ্যাব্রিযিও স্যাবেলী এই কর্মসূচি ও নীতিমালার ফলাফল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলো:

১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সময়কালে আফ্রিকার তেত্রিশটি দেশ মোট ২৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু একই সময়ে দেশগুলোর মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক ২.১% হ্রাস পেয়েছে। মাথা পিছু খাদ্য উৎপাদন হ্রাসের গতি ছিল আরও বেশী ও অদম্য (steady); নিম্নতম মজুরীর প্রকৃত মূল্য হ্রাস পেয়েছিল ২৪%-এর বেশী হারে। সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে নেমে আসে ৭ বিলিয়নে; প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ১৯৮০ সালে ৮০% থেকে ১৯৯০ সালে ৬৯% কমে আসে; এসব দেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ১৯৮৫ সালে ১৮৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালে ২১৬ মিলিয়নে উন্নীত হয়।[১০৮]

২৩৪. খোদ বিশ্ব ব্যাংকের নিজস্ব মূল্যায়ন অনুসারে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সাফল্যের হার ৫০%-এরও কম, যদিও এ হিসাবের ব্যাপারে বিশিষ্ট কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তদুপরি, ১৯৮৯ সালে কৃত পর্যালোচনায় বিশ্ব ব্যাংকের কর্মচারীগণ এমন একটি প্রকল্পেরও উল্লেখ করতে পারেননি যেখানে প্রকল্পের প্রয়োজনে বাস্তুচ্যুত লোকদের জন্য পুনরায় বসতি স্থাপন করা হয়েছে এবং তাদের এমনভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে যাতে বাস্তুচ্যুত হওয়ার পূর্বে তাদের জীবন যাত্রার যে মান ছিল কমপক্ষে সে মানে জীবন যাপন করার সুযোগ তারা আবার পেয়েছে।[১০৯]

২৩৫. এমনকি, যেসব প্রকল্পকে সফল বলে বলা হয়েছে, সে প্রকল্পগুলোও ঋণগ্রস্ত দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে অবদান রাখতে কদাচিৎ সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে মাইকেল রোবোথাম লিখেছেন: "তৃতীয় বিশ্বের ঋণের ওপর এত বেশী লেখালেখি হয়েছে যে, এ বিষয়ে সাহিত্যের সয়লাব সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব গ্রন্থ একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যেমণ্ডিত হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংকের যাবতীয় যুক্তি ও নীতিমালাকে বাহ্যত যুক্তিসংগত তত্ত্বের ওপরই ভিত্তিশীল

www.pathagar.com

করা হয়েছে; কিন্তু এসব স্টাডিতে ঘটনার পর ঘটনা, দেশের পর দেশের নজীর তুলে ধরে দেখানো হয়েছে যে, বাস্তবে এ তত্ত্ব কাজ করছে না। কোথাও দেখা যাচ্ছে ঋণের দ্বারা উন্নয়ন সাধিত হয়েছে ঠিক, কিন্তু তা ঋণ পরিশোধকে অসম্ভব প্রমাণিত করেছে; কোথাও অর্থায়নকৃত প্রকল্পটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশটি বিরাট ঋণের তলায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে, যা পরিশোধ করার আর কোন আশাই অবশিষ্ট নেই; কোথাও আবার পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ করার জন্য বারবার নতুন ঋণ গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। ঋণগ্রস্ত দেশগুলো সামগ্রিকভাবে ১৯৮০ এর তুলনায় পূর্ণ ৬১% অতিরিক্ত ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ১৯৯০ এর দশকে পদার্পণ করেছে।[১১০]

অনেক সমালোচক তৃতীয় বিশ্বের ঋণকে ভূমি-দাস প্রথা (Peonage) বা মুজুরী দাস প্রথার (Wage Slavery) সাথে তুলনা করেছেন। চেরিল পেয়ার এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা হলো:

এই ব্যবস্থার (বর্তমান আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যবস্থা) এক একটি দফার সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে ভূমি-দাস প্রথার তুলনা করা যেতে পারে। ভূমি-দাস প্রথা বা ঋণ-দাসত্ব পদ্ধতিতে ... নিয়োগকর্তা/ঋণদাতা/ব্যবসায়ীদের সামনে কখনও এ উদ্দেশ্য থাকত না যে, ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সম্পূর্ণ পাওনা ঋণ একেবারে উসূল করে ফেলবে; আবার ঋণগ্রহীতা খেতে না পেয়ে মরে যাক সেটাও তারা চাইত না; বরং তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে মজুরদেরকে চিরকালের জন্য নিয়োগকারীর ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে রাখতে...। যথাযথ অর্থে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ ব্যবস্থাই চলছে...। বস্তুত এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ঋণ-দাসত্ব প্রথা। এই ব্যবস্থার অধীনে থাকলে ঋণগ্রস্ত দেশগুলো চিরকাল অনুন্নতই থেকে যাবে অথবা তারা যদি উন্নয়নের মুখ কখনও দেখেও তাহলে তা হবে কেবল তাদের রপ্তানি খাতে যা হবে বহুজাতিক উদ্যোক্তাদের সেবায় নিয়োজিত। নিজ দেশের জনগণের প্রয়োজন পূরণে বাঞ্ছিত উন্নয়নের বিনিময়েই এ উন্নয়ন কিনতে হবে।[১১১]

২৩৬. ১৯৮৭ সালে ইন্সটিটিউট ফর আফ্রিকান অলটারনেটিভ-এর সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বিলুপ্তি দাবী করা হয়; তারা ব্রিটন উড আন্তর্জাতিক মুদ্রা পদ্ধতির প্রধান্যেরও পূর্ণ অবসান দাবী করে। কনফারেন্সে কেইজ স্টাডির ফলাফল সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ফলত সকল ক্ষেত্রেই এসব (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংক) প্রকল্পের

www.pathagar.com

মৌলিক প্রভাব হচ্ছে নেতিবাচক। ব্যাপক বেকারত্ব, প্রকৃত আয় হ্রাস, মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি, অতিরিক্ত আমদানি, অব্যাহত বাণিজ্য ঘাটতি, নীট পুঁজির বহির্গমন, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, কঠোর দুর্দশা এবং শিল্পায়ন ব্যাহত করা (deindustrialization)-এ সবই হচ্ছে এর অশুভ ফল। এমনকি, ঘানা ও আইভরি কোস্ট সম্পর্কে তথাকথিত সাফল্যের যে কাহিনী বলা হয়েছে তাও স্থায়ী সাফল্য হতে পারেনি; বরং সাময়িক উপশম ছাড়া তা আর কিছুই দিতে পারেনি। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি, শিল্প (Manufacturing) এবং সমাজ সেবা খাতসমূহ; আর ঋণ সমন্বয়ের (Adjustment) যাবতীয় বোঝা প্রত্যাবর্তিত হয়ে গিয়ে পড়েছে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর ওপর। [১১২]

২৩৭. তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ বিদেশী ঋণ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না- এই মোহাচ্ছন্ন ধারণার ভ্রান্তি উপলব্ধি করার জন্য উল্লিখিত তথ্যাবলীই যথেষ্ট হওয়া উচিত। আসলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কারা লাভবান হচ্ছে? একজন কানাডীয় স্কলার, জ্যাকস বি. গেলিনাস অত্যন্ত গভীরভাবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'ফ্রিডম ফ্রম ডেস্ট' নামক গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন। তিনি বলেছেন:

বিদেশী ঋণভিত্তিক উন্নয়ন মডেল কোন একটি দেশকেও অর্থনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে পর নির্ভরশীলতা থেকে বের করে আনায় নিজেকে সম্পূর্ণ অক্ষম বলে প্রমাণ করেছে। তবে এ মডেল তৃতীয় বিশ্বের কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অবিশ্বাস্য রকমের সম্পদ অর্জনের উৎসে পরিণত হয়েছে; ফলে এখানে নব্য এক শক্তি এবং সামাজিক রাজনৈতিক শ্রেণীর উত্থান ঘটেছে যাকে যথার্থ অর্থে সাহায্যতন্ত্র (Aidocracy) নামকরণ করা যেতে পারে।[১১৩]

এই অবস্থার সাথে পাকিস্তানে বিদ্যমান অবস্থার তেমন কোন পার্থক্য নেই। এক সময়ে আমরা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলাম, দেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়ন করা দরকার; উপলব্ধি করেছিলাম দারিদ্র্যের অবসান, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং পল্লী এলাকায় হাজার হাজার নর-নারী ও শিশু মৃত্যুর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে সামান্যতম চিকিৎসার অভাবে যেখানে মৃত্যুর প্রহর গুনছে সেখানে অসহায় আদম সন্তানদের কাছে নিম্নতম স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা। আমরা তখন আমাদের জাতীয় বাজেটের ৪৬% বরাদ্দ করেছিলাম সুদ ভিত্তিক ঋণ পরিশোধের জন্য। আর আজ আমরা পূর্ববর্তী কতিপয় ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে নতুন ঋণ গ্রহণে নিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই নতুন ঋণের মেয়াদ শেষ হলে এ দায় পরিশোধের জন্য আবার আমাদের নবতর ঋণ গ্রহণ করতে হবে। এই দুষ্টচক্রের

www.pathagar.com

মধ্যে আমরা আর কতদূর যাব? ঋণের উপরে ঋণের বেড়াজালে আর কতদিন জড়াতে থাকব? ঋণ ভিত্তিক অর্থনীতি আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে; আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঋণদাতাদের হাতে পণবন্দী করে ফেলেছে। সুদী অর্থনীতির এ কঠিন জাল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। এটা আমাদের জাতির মরা-বাঁচার প্রশ্ন; যে কোন মূল্যে এ সমস্যার সমাধান আমাদের করতেই হবে।

২৩৮. আমরা এ সত্য ভুলে যাইনি যে, দেশ ঋণগ্রস্ততার যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে তা থেকে রাতারাতি বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার হচ্ছে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প। মধ্যবর্তী সময়ে, দক্ষ পরিকল্পনার মাধ্যমে যা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে, আমাদেরকে ঋণের এ বোঝা কাঁধে নিয়েই চলতে হবে। তবে মধ্যবর্তী সময়েও ঋণদাতাদের সাথে পুনঃ আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে বিদ্যমান ঋণগুলোকে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিতে রূপান্তরের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিংকে ধন্যবাদ যে, এই ব্যবস্থা একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরী করেছে। ফলে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ এখন পশ্চিমা জগতেও সম্পূর্ণ অপরিচিত নেই। এমনকি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এগুলো জানা ও শেখার জন্য স্টাডি করতে শুরু করেছে।

বিশ্ব ব্যাংকের বেসরকারী শাখা আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) ইতোমধ্যে কিছু ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছে। স্থায়ী সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত ঋণগুলোকে অতি সহজেই ইজারাহ (leasing) পদ্ধতিতে রূপান্তর এবং প্রকল্প ঋণকে ইসতিসনা বিনিয়োগে রূপায়ণ করা যেতে পারে। ঋণদাতাগণ তাদের ঋণের ওপর আয় পেতে চায়; এ ব্যাপারে কোন বিশেষ পদ্ধতির ওপর জেদ বা গোঁ ধরে থাকার কোন কারণ নেই। সুতরাং বিদ্যমান ঋণকে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পুনঃরূপায়ণ করায় তেমন কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। তবে এটা সম্ভব যদি এজন্য সরকারের দৃঢ় সংকল্প থাকে, ইসলামী দায়িত্ববোধের প্রতি থাকে গভীর নিষ্ঠা এবং ইসলামের দাবী পূরণ করার যথার্থ সদিচ্ছা। কৈফিয়তসুলভ আচরণ দ্বারা দীর্ঘকাল অনুসৃত পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়নে অন্যদের রাজী করানো সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স করপোরেশনের (বিশ্ব ব্যাংকের একটি শাখা) প্রেসিডেন্ট হালা স্পিনিং মিলে বিনিয়োগ প্রস্তাব সম্পর্কে আইএফসি-এর পরিচালনা পরিষদে প্রদত্ত তার প্রতিবেদনে যে মন্তব্য করেছেন তা গোটা জাতির জন্য বিব্রতকর। মন্তব্যে তিনি বলেছেন :

www.pathagar.com

ইসলামী পদ্ধতিতে পরিবর্তনের বিষয় আইএফসি বিবেচনা করেছে, কিন্তু এই রূপান্তর হবে বৈদেশিক ঋণের ব্যাপারে সরকারের (পাকিস্তান সরকার) অভিপ্রায় পরিপন্থি।

বিদেশী ঋণদাতা কর্তৃক ইসলামী পদ্ধতি গ্রহণ করে নিলে ওকে, সরকারী নীতির শর্ত পূরণ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিদেশী ঋণদাতাকে সরকারী নীতি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা হতে পারে।[১১৪]

২৩৯. ১৯৯০ সালের ১৭ নভেম্বর পকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর দেশের ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ, পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করণে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আত্ম-নির্ভরশীল উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবনের দায়িত্ব এ কমিটির ওপর ন্যস্ত করা হয়। তদানীন্তন সিনেটর অধ্যাপক খুরশীদ আহমদের নেতৃত্বে গঠিত উক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন সেক্রেটারি, ফাইন্যান্স ডিভিশন এবং অন্যান্য বেশ কয়েকজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ। ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে কমিটি সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। বিস্তারিত আলোচনার পর কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কেবল নির্ভেজাল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেও দেখা যায়, একমাত্র সুদ বিলোপ করার মাধ্যমে স্ব-নির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব। বৈদেশিক ঋণ-সমস্যা সমাধানে এই কমিটির সুপারিশমালা কাজে লাগানো যেতে পারে।

২৪০. সুতরাং বৈদেশিক ঋণ সমস্যা সমাধানের পথে স্বীকৃত সমস্যা ও অসুবিধার কারণে অপরিহার্য আবশ্যকতার ভিত্তিতে বিদেশী ঋণকে সুদের নিষেধাজ্ঞা থেকে চিরকাল বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেহাই দেয়া যেতে পারে না। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অভ্যন্তরীণ ঋণ লেনদেন রূপান্তরে যে সময় দরকার, আন্তর্জাতিক ঋণের ইসলামীকরণে তার চেয়ে অধিক সময় প্রয়োজন হবে। আর এ সময় পর্যন্ত অপরিহার্য আবশ্যকতার তত্ত্ব প্রযোজ্য হবে।

www.pathagar.com

উপসংহার

২৪১. উপরোক্ত আলোচনার সার কথা হচ্ছে:

২৪২. ঋণ বা দেনার আসলের ওপর চুক্তি অনুসারে ধার্যকৃত যে কোন অতিরিক্ত হচ্ছে 'রিবা'। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া মহানবী (সা.) নিম্নে উল্লেখিত লেনদেনগুলোকেও 'রিবা' আখ্যায়িত করেছেন:

ক. অর্থের সাথে অর্থ বদল বা বিনিময়কালে উভয় পক্ষের অর্থ যদি একই জাত ও শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে বিনিময় উপস্থিত হাতে হাতে নগদ হোক বা বাকীতে হোক, উভয় পক্ষের লেনদেন সমান সমান মূল্যের হতে হবে; এ আইন লঙ্ঘন করা হলে অতিরিক্ত অংশ হবে 'রিবা'।

খ. বার্টার-বা পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পণ্য যদি একই জাত ও শ্রেণীভুক্ত হয় এবং ওজন বা পরিমাপযোগ্য হয়, অতঃপর এক পক্ষ কম দিয়ে বেশী নেয় অথবা উভয়ের পণ্য সমান সমান হওয়া সত্বেও কোন এক পক্ষ যদি পরবর্তী কোন সময়ে তার পণ্য প্রদানের শর্ত করে তাহলে এরূপ লেনদেন 'রিবা'য় পর্যবসিত হবে।

গ. বার্টার বা পণ্য বিনিময়কালে উভয় পণ্য যদি ওজন বা পরিমাপযোগ্য ও ভিন্ন ভিন্ন জাত ও শ্রেণীভূক্ত হয় এবং যদি এক পক্ষ তার পণ্য ভবিষ্যতের কোন সময়ে প্রদান করে তাহলে তা 'রিবা' লেনদেন হবে।

২৪৩. উল্লেখিত তিন ধরনের লেনদেনকে ইসলামী আইনশাস্ত্রে 'রিবা আল-সুন্নাহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এগুলোর নিষেধাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবীর (সা.) সুন্নাহ দ্বারা। রিবা আল-কুরআনের ভিত্তিতে রচিত ইসলামী ফিকাহ সাহিত্যে এ চার রকম লেনদেনকেই 'রিবা' বলা হয়েছে।

২৪৪. এই চার ধরনের লেনদেনের মধ্যে ওপরে উল্লেখিত শেষের দুটি অর্থাৎ খ. ও গ. নম্বরে বর্ণিত দুই ধরনের লেনদেন আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বার্টার প্রথা নেই বললেই চলে। তবে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'রিবা আল-কুরআন' ও ওপরে ক. নম্বরে বর্ণিত লেনদেনের যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

২৪৫. উপরে বিস্তারিত আলোচনার আলোকে দেখা যাচ্ছে, রিবার নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঋণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া ঋণের আসল বা দেনার ওপর ধার্যকৃত

www.pathagar.com

অতিরিক্ত কম হোক বা বেশী হোক কোন অবস্থায়ই রিবার নিষেধাজ্ঞায় কোন ব্যতিক্রম করা হয়নি। সুতরাং এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, প্রচলিত সকল প্রকার সুদই ব্যাংকিং লেনদেন ক্ষেত্রে হোক অথবা ব্যক্তি পর্যায়ের লেনদেনে হোক, রিবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। অনুরূপভাবে সরকারী ঋণের ওপর ধার্যকৃত সব ধরনের সুদ, ঋণ অভ্যন্তরীণ হোক বা বহির্বিশ্বের কোন উৎস থেকে নেওয়া হোক, রিবার মধ্যে গণ্য এবং আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

২৪৬. বর্তমান সুদ ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহয় বিঘোষিত ইসলামী নীতিমালা ও বিধিবিধানের পরিপন্থি। এই ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও সংগতিপূর্ণ করে রূপায়ণ করতে এর আমূল পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হবে।

২৪৭. ইসলামী স্কলার, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারগণ বিভিন্ন ধরনের ইসলামী অর্থায়ন/ বিনিয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করেছেন। এসব পদ্ধতি সুদের উত্তম বিকল্প হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ২০০ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসকল পদ্ধতি অনুশীলন করছে।

২৪৮. এইসব ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি বর্তমান থাকা অবস্থায়, অপরিহার্য আবশ্যকতার ভিত্তিতে সুদী লেনদেন চিরকাল চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। আদালতের সামনে বিশিষ্ট কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যাংকার হাজির ছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন দেশের বাইরে থেকে। তারা হলেন: ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী, প্রেসিডেন্ট ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দা; জনাব আদনান আল-বাহ্‌র, প্রধান নির্বাহী, ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর, কুয়েত; জনাব ইকবাল আহমদ খান, প্রধান নির্বাহী, ইসলামিক ইউনিট, লন্ডন ভিত্তিক হংকং-সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (HSBC), দেশের ভেতর থেকে যারা ছিলেন তাঁরা হলেন : জনাব আবদুল জব্বার খান, সাবেক প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, জনাব শহীদ হাসান সিদ্দিকী এবং জনাব মকবুল আহমদ খান। এদের সকলেই বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ব্যাংকিং কাজ করে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তারা সকলেই একমত যে, ইসলামী পদ্ধতিসমূহ ব্যাংকিং ক্ষেত্রের জন্য কেবল উপযোগীই নয় বরং এ পদ্ধতিগুলো ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকতর কল্যাণকরও। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ বিস্তারিত প্রমাণও তারা আদালতে উপস্থাপন করেছেন। ড. ওমর চাপরা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, সউদী মনিটারী এজেন্সী; ড. আরশাদ জামান, সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ, অর্থমন্ত্রণালয়, গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান; অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, ড. নওয়াব হায়দার নকভী এবং ওয়াকার মাসুদ খান প্রমুখ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী অর্থনীতিবিদগণ তাদের বক্তব্যে উক্ত মতকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

২৪৯. দি কাউন্সিল অব ইসলামিক ইডিওলোজি কর্তৃক ১৯৮০ সালে সরকারের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট, ১৯৯১ সালে গঠিত দি কমিশন ফর ইসলামাইজেশন অব ইকোনমি কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্ট এবং ১৯৯৭ সালে পুনর্গঠিত একই কমিশন কর্তৃক ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে সরকারের কাছে উপস্থাপিত রিপোর্ট আমরা আদ্যপান্ত অধ্যয়ন করেছি। এছাড়া প্রাইম মিনিস্টার্স কমিটি অন সেলফ রিলায়েন্স কর্তৃক ১৯৯১ সালের এপ্রিলে সরকারের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্টটিও আমরা পাঠ করেছি।

২৫০. সুতরাং প্রচলিত সুদী আর্থিক ব্যবস্থাকে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যবস্থায় রূপান্তরের যথোপযুক্ত কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রচুর গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক করা হয়েছে বলে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আর অপরিহার্য আবশ্যকতার যুক্তিতে প্রচলিত সুদ ভিত্তিক পদ্ধতিকে অনির্দিষ্ট কাল বহাল রাখা যায় না। তবে এই ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় রূপান্তরে অবশ্যই কিছু সময় লাগবে। অপরিহার্য আবশ্যকতার যুক্তিতে এ প্রয়োজনীয় সময় অনুমোদন করা যেতে পারে।

২৫১. উপরে উল্লিখিত কারণে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আদালতের আদেশে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে এতদ্বারা সবগুলো আপীল খারিজ (Dismissed) ঘোষণা করা যাচ্ছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহীল করীম ওয়া আ'লা আ-লেহী ওয়া আসহাবেহী আজমাঈন।

আদালতের আদেশ

বিচারপতি খলিলুর রহমান খান, বিচারপতি ওয়াজিহুদ্দিন আহমেদ ও বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী কর্তৃক লিখিত পৃথক পৃথক তিনটি রায়ে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ কারণসমূহের প্রেক্ষিতে এমর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ভোগ বা উৎপাদন যে উদ্দেশ্যেই হোক, নির্বিশেষে সকল ঋণ বা দেনার চুক্তিতে আসলের ওপর ধার্যকৃত, কম হোক বেশী হোক, যে কোন অতিরিক্তই হচ্ছে আল-কুরআনে হারাম ঘোষিত 'রিবা'। এছাড়া নবী করীম (সা.) আরও কতিপয় লেনদেনকে রিবা আখ্যায়িত করেছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. অর্থের বিনিময়ে অর্থ লেনদেনে উভয় পক্ষের অর্থ যদি একই জাত ও শ্রেণীভুক্ত হয় এবং উভয় পক্ষ যদি সমান সমান পরিমাণের অর্থ লেনদেন না করে, তাহলে বিনিময় তাৎক্ষণিক হাতে হাতে নগদে (spot transaction) হোক অথবা বাকীর ভিত্তিতে হোক, সে লেনদেন হবে 'রিবা';

২. বার্টার বা পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময় সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলো যদি ওজন বা পরিমাপ যোগ্য হয় এবং একই জাত ও শ্রেণীভুক্ত হয় এবং যদি উভয় পক্ষের পণ্যের পরিমাণ

www.pathagar.com

অসমান হয় অথবা কোন এক পক্ষ যদি তার পণ্য প্রদান ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত বা বাকী রাখে তাহলে এরূপ লেনদেন 'রিবা' লেনদেনে পর্যবসিত হবে।

৩. বার্টার বা পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময়ে পণ্য যদি ভিন্ন ভিন্ন জাত ও শ্রেণীভুক্ত হয় এবং সেগুলো যদি ওজন বা পরিমাপযোগ্য হয় আর কোন এক পক্ষ যদি তার পণ্য প্রদান স্থগিত বা বাকী রাখে তাহলে তা 'রিবা' লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইসলামী আইন শাস্ত্রে উল্লেখিত এই তিন ধরনের লেনদেনকে বলা হয়েছে 'রিবা আল-সুন্নাহ'; কারণ এরূপ লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবীর (সা.) হাদীস বা সুন্নাহর দ্বারা। 'রিবা আল-কুরআন'সহ রিবা লেনদেনের ধরন দাঁড়াল চার রকম। আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইসলামী ফিকাহ সাহিত্যে এই চার ধরনের লেনদেনকে 'রিবা' বলা হয়েছে।

উল্লিখিত চার ধরনের লেনদেনের মধ্যে শেষের দুটি অর্থাৎ খ. ও গ. নম্বরে উল্লিখিত লেনদেনগুলো আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়; কারণ আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বার্টার লেনদেন নেই বললেই চলে। তবে আধুনিক কালের কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে 'রিবা আল-কুরআন' ও উপরের ক. নম্বরে উল্লেখিত, অর্থের সাথে অর্থ বিনিময়ের যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। তাছাড়া ঋণ বা দেনার ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত, কম হোক বা বেশী হোক, কোন অবস্থায়ই রিবার নিষেধাজ্ঞায় কোন ব্যতিক্রম করা হয়নি। সুতরাং এই মর্মে রায় দেয়া যাচ্ছে যে, প্রচলিত সকল প্রকার সুদই, তা ব্যাংকিং লেনদেনে হোক অথবা ব্যক্তি পর্যায়ের লেনদেন হোক, হচ্ছে 'রিবা'র সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। তেমনি সরকারী ঋণ, অভ্যন্তরীণ বা বহির্বিশ্ব যে কোন উৎস থেকেই নেয়া হোক না কেন, এ ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদও হচ্ছে রিবা যা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা আল-কুরআন ও সুন্নাহ বিঘোষিত ইসলামী নীতিমালা ও বিধি-বিধানের পরিপন্থি। এই ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও সংগতিপূর্ণ করে রূপায়ণ করতে হলে একে আমূল পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হবে। ইসলামী স্কলার, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারগণ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী অর্থায়ন ও বিনয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করেছেন। এসব পদ্ধতি সুদের উত্তম বিকল্প হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে প্রায় দুইশত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এসব ইসলামী পদ্ধতি অনুশীলন করা হচ্ছে।

এসব সুদমুক্ত ইসলামী বিকল্প পদ্ধতি বর্তমান থাকা অবস্থায় অপরিহার্য আবশ্যকতার ভিত্তিতে সুদী লেনদেন চিরকাল অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। আদালতে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যাংকার হাজির ছিলেন। তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে পাকিস্তানের বাইরে থেকে ছিলেন: ড: আহমদ মুহাম্মদ আলী, প্রেসিডেন্ট, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দা; জনাব আদনান আল-বাহ্‌র, চিফ এক্সিকিউটিভ, ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর, কুয়েত; জনাব ইকবাল আহমদ খান, চিফ এক্সিকিউটিভ, ইসলামিক ইউনিট, লন্ডন ভিত্তিক হংকং-সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (HSBC)। পাকিস্তানের ভেতর থেকে ছিলেন : জনাব আবদুল জব্বার খান, সাবেক প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান; জনাব শহীদ হাসান সিদ্দিকী ও জনাব মকবুল আহমদ খান। তারা সকলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাংকিং কাজে নিয়োজিত থেকে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এসব অভিজ্ঞ ব্যাংকারদের সকলেই এ ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ কেবল উপযোগীই নয় বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকতর সুবিধাজনক ও কল্যাণকরও। এ মতের সমর্থনে তথ্য-প্রমাণাদিও তারা আদালতে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া ড. এম, ওমর চাপরা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, সউদি মনিটারি এজেন্সী; ড. আরশাদ জামান, সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ, অর্থ মন্ত্রণালয় গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান; অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, ড. নওয়াব হায়দার নকভী ও ড. ওয়াকার মাসুদ খান প্রমুখ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী অর্থনীতিবিদগণ তাদের বক্তব্যে এ মতকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন।

দি কাউন্সিল অব ইসলামিক ইডিওলোজি কর্তৃক ১৯৮০ সালে সরকারের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট, ১৯৯১ সালে গঠিত দি কমিশন ফর ইসলামাইজেশন অব ইকোনমি কর্তৃক সরকারের কাছে পেশকৃত রিপোর্ট এবং ১৯৯৭ সালে পুনর্গঠন করার পর একই কমিশন কর্তৃক ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে সরকার সমীপে উপস্থাপিত রিপোর্ট –এ সব কয়টি রিপোর্ট আমরা আদ্যপান্ত অধ্যয়ন করেছি। এছাড়া প্রাইম মিনিস্টার'স কমিটি অন সেলফ রিলায়েন্স কর্তৃক ১৯৯১ সালের এপ্রিলে সরকারের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্টটিও আমরা পাঠ করেছি। সুতরাং প্রচলিত সুদী আর্থিক ব্যবস্থাকে সুদমুক্ত ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের উপযোগী কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রচুর গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক করা হয়েছে বলে প্রমাণ করার মত যথেষ্ট মাল-মশলা ও তথ্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আর অপরিহার্য আবশ্যকতার যুক্তিতে প্রচলিত সুদভিত্তিক পদ্ধতিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহাল রাখা যায় না। তবে এই ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় রূপান্তরে অবশ্যই কিছু সময় লাগবে। অপরিহার্য আবশ্যকতার যুক্তিতে এই প্রয়োজনীয় সময় অনুমোদন করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

তথ্য সূত্র

১. ইবনে জরির : তফসীর জামে আল-বয়ান, দার-উল-ফিকর, বৈরুত, ভলি-২১, পৃ: ৪৬-৪৮।

২. ইবনে আল-জওযি: যাদ-উল-মাসির, আল-মাকতব-আল-ইসলামী, বৈরুত, ১৯৬৪, ভলি-৬, পৃ:-৩০৪।

৩. ইবনে হাজার: ফাত্হ-উল-বারি, মক্কা, ১৯৮১, ভলি-৮, পৃ:-২০৫।

৪. আল-রাযি: আল-তফসীর আল-কবীর, তৃতীয় সংস্করণ, ইরান, ভলি-৯, পৃ:-২

৫. আবু দাউদ: আল-সুনান, হাদীস নং ২৫৩৭, ভলি-৩, পৃ:- ২০।

৬. ইবনে আতিয়্যা : আল-মুহাররার-আল-ওয়াজিয, দোহা, ১৯৭৭, ভলি-২, পৃ:-৪৮৯।

৭. ইবনে জরির : (op.cit) ভলি-৩, পৃ: ১০৭, আল-ওয়াহিদি, আলওয়াসিত, ভলি-১, পৃ:-৩৯৭, ইবনে আতিয়্যা, op.cit পৃ:-৪৮৯, এবং আল-ওয়াহিদি, আসবাব আল-নুযুল, রিয়াদ, ১৯৮৪, পৃ:-৮৭।

৮. ইবনে হাজার: আল-ইসাবাহ্, ভলি-২, পৃ:-২৬৩।

৯. আল-ওয়াহিদি: op.cit।

১০. সহীহ্ আল-বুখারী: কিতাব আল-তফসীর, অধ্যায়-৫৩, হাদীস নং-৪৫৪৪।

১১. ইবনে হাজার : op.cit, পৃ:-২০৫।

১২. আল-জাসাস : আহকামুল কুরআন, ভলি-১, লাহোর, ১৯৮০, পৃ:-৪৬৫।

১৩. op.cit পৃ:-৪৬৯।

১৪. আল- রাযি : op.cit ,ভলি-৭, তেহরাণ, পৃ:- ৯১।

১৫. ইবনে জরির : তফসীর ইবনে জরির, ভলি-৩, পৃ:-১০১।

১৬. op.cit পৃ:-১০১।

১৭. আল-সুয়ূতি : লুবাব আল-নুকুল, পৃ:-২০।

১৮. তফসীর ইবনে আবি হাতিম, ভলি-২, মক্কা, ১৯৯৭, পৃ:-৪৫৪।

১৯. আবু হাইয়ান : আলবাহর-আল-মুহীত, ভলি-২, পৃ:-৩৩৫

২০. আল- জাসাস : op.cit পৃ:-৪৬৯।

২১. সহীহ্ মুসলিম, করাচী, ভলি-২, পৃ:-২৫।

২২. ইসলামী আইন শাস্ত্রের সকল গ্রন্থেই এই মতপার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন : ইবনে কুদামা ; আল মুঘনি, দার-আল-কুতুব-আল-ইলমিয়্যাহ্ বৈরুত, ভলি-৪, পৃ:-১২৪-১২৭।

২৩. আল-বুখারী, হাদীস নং-৫২৬৬।

২৪. আব্দুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, বৈরুত, ভলি-৮, পৃ:-২৬।

২৫. ইবনে মাজাহ্ : বুক-১২, অধ্যায়-৫৮, হাদীস নং- ২২৭৬, রিয়াদ ১৯৯৯।

www.pathagar.com

২৬. ইবনে হাজার: তাহযিব-আল-তাহযিব, ভলি-৪, পৃ:-৬৪-৬৫।

২৭. অধ্যাপক এম.এম. পোস্টান (ক্যামব্রিজ, ১৯৪৪) তার 'ক্রেডিট ইন মেডিয়্যাভ্যাল ট্রেড' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মধ্যযুগে সব ধরনের বাণিজ্যিক ঋণ লেনদেন করা হতো। এসেজ ইন ইকোনমিক হিস্টরি, সম্পাদনা: ই, এম, ক্যারাস উইলসন এডওয়ার্ড আরনল্ড, লন্ডন, ১৯৬৬, ভলি: ১, পৃ: ৬১-৮৭।

২৮. এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা, ১৯৫০ সংস্করণ, ব্যাংকস হিস্টোরি, ভলি:৩, পৃ. ৬৭।

২৯. উইল ডুর‍্যান্ট: দি স্টোরি অব সিভিলাইজেশন, সাইমন এন্ড স্কাস্টার, নিউইয়র্ক, ১৯৬৬, পৃ:-২৭৪, চ্যাপ্টার -১২।

৩০. গীবন: দি ডিকলাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার, চ্যাপ্টার ৪৪, দি ইন্সটিটিউটস IV, ভলি: ২, পৃ:- ৯০।

৩১. আল-বালাযুরি, ফুতুহ আল-বুলদান, পৃ:- ৪৫৩-৫৪, বৈরুত, ১৯৮৩ এবং আল-মাসুদী, মারুজ-আল-যাহাব, ভলি-২, পৃ:-৩৩৩।

৩২. আবুলফারাজ, আল-আঘানি, ভলি-২, পৃ:- ৫২।

৩৩. ইবনে আল-আনবারী।

৩৪. লুওয়াইস শিখু: খৃস্টানিটি এন্ড ইটস কালচার এমং দি জাহিলী আরবস, ভলি-২, পৃ:-৩৮৭।

৩৫. আল-নাজুম আল-যাহিরাহ: ১:১৭৬ : এর কারণ ছিল যে, আব্দুল মালিক রোম সম্রাটের কাছে লিখা তাঁর এক পত্রে আল-কুরআনের সূরা ইখলাস এবং নবীর (সা.) নাম সম্বলিত 'লগো' ব্যবহার করেন। এটা দেখে রোম সম্রাট ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আব্দুল মালিককে লিখে পাঠায় যে, যদি সে এ 'লগো' ব্যবহার চালু রাখে তাহলে তারা দিনারে নবী (সা.) সম্পর্কে খারাপ শব্দ খোদাই করে দেবে। এ প্রেক্ষিতে আব্দুল মালিক তাঁর নিজ দিনার চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৩৬. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব (বুক-৬৩, অধ্যায়-১৯, হাদীস নং-৩৮১৪)।

৩৭. আল-বায়হাকী: আল সুনান-আল-কুবরা, ভলি-৫, পৃ:-৩৪৯।

৩৮. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২: ১৯, ২০।

৩৯. দি বাইবেল: জেনেসিস, ৩৭:২৫।

৪০. ড. জাওয়াদ আলী: আল মুফাসসাল ফী তারিখ আল আরাব ক্বাবাল-আল-ইসলাম, ভলি-৭, পৃ:-২২৭-৪৪৪ : এখানে তিনি ইসলাম পূর্বযুগে আরবদের বাণিজ্যিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

৪১. আল-যুবাইদি, তাজ-আল-আরুস, ৬:৪৪।

৪২. নিহায়া আল-আরব ১৭:৮১, ইমতা-আল-আসমা, ভলি-১, পৃ:-৭৫, কায়রো, ১৯৮১।

৪৩. ইমতা আল-আসমা, op.cit এবং আল-যুরকানি, শারহ্ আল-মাওয়াহিব ভলি-১, পৃ:-৩৬৬।

www.pathagar.com

৪৪. ড: জাওয়াদ আলী, op.cit পৃ:-২৯০।
৪৫. আত-তাবারি, op.cit ভলি-৩, পৃ:-১০৭।
৪৬. আত-তাবারি, op.cit ভলি-২১, পৃ:-৪৭।
৪৭. আত-তাবারি, op.cit
৪৮. আল-হায়থামি, মাজমা-আল-যাওয়ায়িদ, ভলি-৪, পৃ:-১৩৩।
৪৯. আল-বুখারী, কিতাব-৩৯, হাদীস নং- ২২৯১।
৫০. ফাতহ্ আল, বারি, ভলি-৪, পৃ:-৪৭১। আল-বুখারী ও বুক-৩৪, অধ্যায়-১০ হাদীস নং-২০৬৩।
৫১. আল-সুহাইলি: আল-রাউদ-আল-উনুফ, ভলি-২, পৃ:-৬২, মুলতান ১৯৭৭, ইবনে কাসির: আল সীরাহ্ আল নববীয়্যাহ্, ভলি-২, পৃ:-৩৮৩, আত্তাবারি, তারিখুল উম্মাহ, ভলি-২, পৃ:-১৩৭।
৫২. সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বই-৭, অধ্যায়-১৩, হাদীস নং-৩১২৯, এবং হাফিজ ইবনে হাজার আল-আসকালনি, ফাতহ আল-বারি, ভলি-৬, পৃ:-১৬২।
৫৩. ইবনে সা'দ: আল-তাবকাত আল-কুবরা, বৈরুত, ভলি-৩, পৃ:-২৭৮।
৫৪. আত-তাবারি: তারিখ আল-উম্মাহ্, ভলি-৩, পৃ:-৮৭ (২৩ হিজরীর ঘটনা)।
৫৫. আল-বায়হাকি: আল-সুনান আল-কুবরা, ভলি-১০, পৃ:-১৮৪।
৫৬. ইবনে সা'দ: আল-তাবকাত, ভলি-৩, পৃ:-১৬৩।
৫৭. সহীহ্ আল-বুখারী : কিতাব আল-মানাকিব (বই-৬৩, অধ্যায়-১৯, হাদীস নং-৩৮১৪)।
৫৮. ইবনে সা'দ: op.cit পৃ:-৩৫৮।
৫৯. ইমাম মালিকঃ আল-মুয়াত্তা, বাব আল- ক্বিরাদ।
৬০. তফসীর ইবনে আবি হাতিম, ভলি-২, পৃ:-৫৫১, হাদীস নং-২৯২৫ ও তফসীর ইবনে কাসীর, ভলি-১, পৃ:-৩৩১।
৬১. আল- শওকানি: নাইল-আল-আওতার, ভলি-৫, পৃ:-১৯৮।
৬২. ইমাম মালিক: মুয়াত্তা, পৃ:-৬১৩, নুর মোহাম্মদ, করাচী।
৬৩. ইমাম মালিক : op.cit
৬৪. আল-বায়হাকিঃ আল-সুনান আল-কুবরা, ভলি-৫, পৃ:-৩৫০।
৬৫. op.cit
৬৬. op.cit
৬৭. আল-সুয়ূতি: আল-জামে আল-সগীর, ভলি-২, পৃ:-৯৪।
৬৮. আল- সুনাভি : ফায়যুল-ক্বাদির, ভলি-৫, পৃ:-২৮।
৬৯. আল-আযিযী: আল-সিরাজ আল- মুনির, ভলি-৪, পৃ:-২০, মদীনা।
৭০. ইবনে হাজার: আল-তালখিস আল-হাবির, ভলি-৩, পৃ:-৯৯৬, হাদীস নং-১২২৭ মক্কা ১৯৯৭।

www.pathagar.com

৭১. আল-সুনান আল-কুবরা, ভলি-৫, পৃ:-৩৫০।
৭২. আল-বায়হাকি: মা'রিফাহ আল-সুনান ওয়া আল-আতহার, ভলি-৮, পৃ:-১৬৯।
৭৩. সহীহ্ আল-বুখারী, বই নং- ৩৪, অধ্যায় ৭৮, হাদীস নং- ২১৭৭।
৭৪. আল-জাসাস, আহকামুল কুরআন, লাহোর ১৯৮০, ভলি-১, পৃ:- ৪৮২, ৪৮৩।
৭৫. ইবনে মাজা, আল-সূনান, ভলি-৩, পৃঃ-১৫৪, হাদীস নং ২৪৩১, বৈরুত, ১৯৯৬, (উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটিকে আল-বাসিরী প্রমুখ দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন)।
৭৬. এ হচ্ছে ইমাম গাজালী কর্তৃক বিস্তারিত আলোচনার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ; ইমাম গাজালী তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি এহইয়া উলমুদ্দীন গ্রন্থে (কায়রো ১৯৩৯) ৪র্থ খণ্ডের ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এতে তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, অর্থের কারবার নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান এক জাতের মুদ্রার (একই দেশের) সমমানের এককের বিনিময় কালে প্রযোজ্য। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময়কে তিনি বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ উভয় ধরনের বিনিময়ের পার্থক্যও ব্যাখ্যা করেছেন।
৭৭. লুডউইগ ভন মাইসেস: দি থিওরি অব মানি এন্ড ক্রেডিট, লিবার্টি ক্ল্যাসিক্স ইন্ডিয়ানা পোলিস, ১৯৮০, পৃ:- ৯৫।
৭৮. পূর্বে উল্লিখিত, পৃ:- ৯৫।
৭৯. দি রিপোর্ট অব দি ইকোনোমিক ক্রাইসিস কমিটি, সাউদাম্পটন চেম্বার অব কমার্স, ১৯৩৩, পার্ট-৩, (iii) প্যারা-২ (মিঃ পি,এম, পিওকক ডাইরেক্টর, ইন্সটিটিউট অব রেশন্যাল ইকোনমিক্স-কে ধন্যবাদ। তিনি অনুগ্রহ করে এ রিপোর্টের একটা কপি আমাদের দিয়েছেন।
৮০. দি রিপোর্ট অব ইকোনমিক ক্রাইসিস কমিটি, সাউদাম্পটন চেম্বার অব কমার্স, ১৯৩৩।
৮১. জন গ্রে, ফলস ডন দি ডিলিউশন্স অব ক্যাপিট্যালিজম, গ্র্যান্টি বুকস, লন্ডন, ১৯৯৮, পৃ:- ৬২; ১৯৯৫, ২৪ অক্টোবরের ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল অবলম্বনে; ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস, বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৫ এবং মাইকেল এলবার্ট, ক্যাপিটালিজম ওরিজিন্যাল ক্যাপিটালিজম, লন্ডন হোর পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ:- ১৮৮।
৮২. রিচার্ড থমসন : এ্যাপোক্যালিপস রুলেট : দি লেথাল ওয়ার্ল্ড অব ডেরাইভেটিভস, ম্যাকমিলন, লন্ডন ১৯৯৮, পৃ:- ৪।
৮৩. জেমস রবার্টসন, ট্রান্সফরমিং ইকোনমিক লাইফ ঃ এ মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ, গ্রীনবুকস, ডেভন, ১৯৯৮।
৮৪. আল-গাজালী, ইয়াহ ইয়া উল উলুম।
৮৫. সহীহ্ বুখারী, বুক-৩৯, অধ্যায়-৩ হাদীস নং-২২৯৫
৮৬. ওইসিডি কালচারাল ইনডিকেটরস ১৯৯৬, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এন্ড কাউন্সিল ফর মর্টগেজ লেন্ডারস স্ট্যাটিসস্টিকস; উদ্ধৃত করেছেন, মাইকেল রোবোথাম ইন 'দি গ্রিপ অব ডেথ' জন কার্পেন্টার পাবলিশিং, ইংল্যান্ড ১৯৯৮, পৃ:- ৬৫।

www.pathagar.com

৮৭. পিটার ওয়ারবারটন: ডেট এন্ড ডেলিউশন, এলেন লেন, লন্ডন ১৯৯৯, পৃ:-১৬১

৮৮. থুরো, লেস্টার, জিরো-সাম সোসাইটি (নিউইয়র্ক: ব্যাসিক বুকস, ১৯৮০) পৃ:-১৭৫।

৮৯. বিগস্টেন, আরণে, 'প্রভারটি, ইনইক্যুয়ালিটি এন্ড ডেভেলাপমেন্ট' ইন নরম্যান গেমেল, সার্ভেস ইন ডেভেলাপমেন্ট ইকোনমিকস (অক্সফোর্ড: ব্ল্যাকওয়েল ১৯৮৭) পৃ:- ১৫৬।

৯০. মরগান গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানী অব নিউইয়র্ক, ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস্, জানুয়ারি, ১৯৮৭ পৃ:- ৭, উদ্ধৃত করেছেন ড. চাপরা।

৯১. স্ট্যাটিস্টিক্যাল বুলেটিন অব স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ:-৪৭, এনেক্সার-বি।

৯২. জেমস রবার্টসন, ফিউচার ওয়েল্‌থ: এ নিউ ইকোনমিকস ফর দি ২১শ সেঞ্চুরি, ক্যাসেল পাবলিকেশন্স, লন্ডন, ১৯৯০, পৃ. ১৩০, ১৩১।

৯৩. উপরোল্লেখিত: ট্রান্সফরমেশন অব ইকোনমিক লাইফ : এ মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ, গ্রীন বুকস, ডেভন, ১৯৯৮, পৃ:- ৫১-৫৪।

৯৪. আকর্ষণীয় ও চক্ষু উন্মিলনকারী এ ইতিহাস বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নের গ্রন্থগুলো উপযোগী হতে পারে:

1. মাইকেল রোবোথাম: দি গ্রিপ অব ডেথ- এ স্টাডি অব মডার্ন মানি, জন কারপেন্টার, ইংল্যান্ড ১৯৯৮, অধ্যায় ১৩-১৫।

2. প্যাট্রিক এস, জে, কারম্যাক এন্ড বিল স্টিল : দি মানি মাস্টারস, রয়ালটি প্রডাকশন কোম্পানী, ইউএসএ, ১৯৯৮।

3. উইলিয়াম গাই কারর : পন্স ইন দি গেইম, ফ্লা, ইউএসএ, অধ্যায়-৬।

4. রবার্ট ও প্রিসকোল এন্ড মারগারিটা ইভানফ ডিউভ্রোসকি : দি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, কানাডা ১৯৯৩।

৯৫. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড রিলিজেস, ১৯৯৫, ১৯৯৭; উদ্ধৃত করেছেন মাইকেল রোবোথাম: ইতিপূর্বে উল্লেখিত, পৃ:- ১৩।

৯৬. প্যাট্রিক এস.জে. কারম্যাক এন্ড বিল স্টিল: দি মানি মাস্টারস, হাউ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকারস গেইনড কন্ট্রোল অব আমেরিকা, রয়ালটি প্রডাকশন কোম্পানী, ১৯৯৮, পৃ:- ৭৮, ৭৯।

৯৭. মাইকেল রোবোথাম: প্রাগুক্ত পৃ:-২৭, ২৮।

৯৮. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ : ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং : দি চ্যালেঞ্জ অব দি ২১th সেঞ্চুরি, দি পেপার ii, লেখক কর্তৃক আদালতে দাখিলকৃত।

৯৯. টাইম, নভেম্বর ৩, ১৯৯৭, নিউজ উইক, জানুয়ারি ২৬, ১৯৯৮, এবং সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৯৮।

১০০. জেমস রবার্টসন : ট্রান্সফরমিং ইকোনমিক লাইফ: এ মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ, গ্রীন বুক, ডেভন, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

১০১. জেমস রবার্টসন: প্রাগুক্ত, পৃ:- ৫৪।
১০২. জন টমলিনসন: অনেষ্ট মানি: এ চ্যালেঞ্জ অব ব্যাংকিং, হেলিক্স, ১৯৯৩ পৃ:- ১১৫-১১৮।
১০৩. মাইকেল রোবোথাম: প্রাগুক্ত, পৃ:- ৩৩।
১০৪. ফিলিপ মূর: ইসলামিক ফাইন্যান্স: এ পার্টনারশিপ ফর গ্রোথ, ইউরোমানি পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ: ৭৩।
১০৫. মোহসিন এইচ, খান এন্ড আব্বাস মিরাখোর: থিওরিটিক্যাল ষ্টাডিজ ইন ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স, হিউস্টন, ১৯৮৭, পৃ:- ১৬৮।
১০৬. পিটার ওয়ারবার্টন: ডেস্ট এন্ড ডিলিউশন: সেন্ট্রাল ব্যাংক ফলিজ দ্যাট থ্রেটেন ইকোনমিক ডিজাস্টার, এলেন লেইন, ১৯৯৯ পৃ:-২২৪-২২৫।
১০৭. সুসান জর্জ: দি ডেস্ট বুমেরাং, হাউ দি থার্ড ওয়ার্ল্ড ডেস্ট হার্মস আস অল, প্লুটো প্রেস, লণ্ডন, ১৯৯২।
১০৮. সুসান জর্জ, ফ্যাব্রিযিও স্যাবেলি: ফেইথ এণ্ড ক্রেডিট, দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক'স সেকুলার এম্পায়ার, পেংগুইন, ১৯৯৮, পৃ:-১৪১।
১০৯. ডেভিড কোরেন্ট : হুয়েন করপোরেশনস রুল দি আর্থ, আর্থস্ক্যান ১৯৯৩; উদ্ধৃত করেছেন, মাইকেল রোবোথাম, "দি গ্রিপ অব ডেথ" পৃ:- ১৩৫।
১১০. মাইকেল রোবোথাম : দি গ্রিপ অব ডেথ, পৃ:- ১৩৭।
১১১. চেরিল পেয়ার : দি ডেস্ট্যাপ: মানথলি রিভিউ প্রেস, ১৯৭৪; উদ্ধৃত করেছেন, মাইকেল রোবোথাম- প্রাগুক্ত, পৃ:-১৩৭।
১১২. বেইড অনিমোড : দি আইএমএফ, দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এণ্ড আফ্রিকান ডেট, যেড বুকস, ১৯৮৯, উদ্ধৃত করেছেন রোবোথাম, প্রাগুক্ত পৃ:- ১৩৭।
১১৩. জ্যাকস বি. গেলিনাস: ফ্রীডম ফ্রম ডেস্ট, যেড বুকস, লন্ডন এণ্ড নিউইয়র্ক, ১৯৯৮, পৃ:- ৫৯।
১১৪. নং আইএফসি/পি-৮৮৭, তাং ডিসেম্বর ২২, ১৯৮৭; উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপক খুরশীদ আহমদের নেতৃত্ব গঠিত দি প্রাইম মিনিস্টার'স কমিটি অন সেলফ-রিলায়েন্স-এর রিপোর্ট-১৯৯১, ইসলামাবাদ।

www.pathagar.com